সত্যি গোয়েন্দা কাহিনী

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

উৎসর্গ

পুলিস বিভাগের যেসব সাহসী ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে দেশে শান্তি রক্ষা ও অপরাধ রোধের জন্য সর্বদা সচেষ্ট, এই বইখানি তাঁদেরই হাতে সমর্পণ করা হল।

ভূমিকা

পুলিসের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে লিখিত এই বইটির ভূমিকা লেখার ভার আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন রাজ্যে যেসব অপরাধমূলক ঘটনা পুলিস সাফল্যের সঙ্গে অনুসন্ধান করেছে এ বইখানি সেই সব কাহিনীর এক সংগ্রহ। মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব কাহিনী পড়ে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের রহস্যোদ্‌ঘাটনের জন্য পুলিসকে কতরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এই বই-এর অধিকাংশ কাহিনীর বাস্তব বিবরণ পড়লে বুঝতে পারা যায় অপরাধ অনুসন্ধানের কাজে পুলিসের ঐকান্তিক চেষ্টা, বুদ্ধি বিবেচনা ও ধৈর্য কতখানি প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, সান্যাল হত্যা মামলার কথা বলা যায়। একজন আসামীর খোঁজ পেয়ে তার স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে শুধু অপর তিনজন আসামীকে খুঁজে বার করাই নয়, উপরন্তু চারজন অপরাধীকে খুনের সঙ্গে জড়িত দেখে তাদের অপরাধ প্রতিপন্ন করবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণগুলি একত্র করা পুলিসের পক্ষে কম কৃতিত্বের নয়। এই বিশেষ খুনের মামলায় ঘটনাস্থলে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো পুলিস পেয়েছিল, তারপর একজন অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার সময় তার প্যান্টের ভাঁজে কাঁচের টুকরো দেখতে পাওয়া তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টির পরিচায়ক। কারণ ঐ কাঁচের টুকরোই অপরাধীকে ধরিয়ে দেবার প্রধান প্রমাণরূপে গণ্য হল। সেইরকম গেটের সামনে চটি খুঁজে পাওয়া অন্য অপরাধীর উপস্থিতির প্রমাণ। অন্য আর একটি মামলায় ঘটনাস্থলে পুলিস কেবল একটা ব্যবহৃত স্কুলের খাতার ছেঁড়া পাতা পেয়েছিল। কিন্তু সেই ছেঁড়া পাতার সূত্র ধরে ডাকাতের একটা পুরো দলকে ধরে ফেলেছিল।

আর একটি হত্যার মামলায় অপরাধীরা রক্তের দাগ লুকোবার জন্য স্থানটি আগাগোড়া চুন গোবর ইত্যাদি দিয়ে লেপে দিয়েছিল। সেই প্রলেপের তলা থেকে প্রাপ্ত মাটির সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খুঁজে বার করা হয়।

এইরকম একটার পর একটা আরও প্রমাণ জুড়ে তবেই আদালতের সামনে অপরাধের প্রমাণ করে তাকে দণ্ড দেওয়া সম্ভব হয়। চুরির অন্য একটা মামলায় পুলিসের হাতে এমন একটা জিনিসও পড়েনি যার সূত্র ধরে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অপরাধীকে ধরা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে কেবল সন্দেহ বশত সম্ভাব্য অপরাধীদের কার্যকলাপের ওপর দৃষ্টি রেখে অপরাধী ধরা পড়ে। যেমন চুরির পরই সন্দেহ-জনক ভাবে কিছু জিনিসপত্র কেনা হয়েছে কেবলমাত্র এই খবর পাওয়ার ফলেই পুলিসের পক্ষে চোর ধরা সম্ভব হয়েছিল। অপরাধীদের খুঁজে বার করার সঙ্গে তাদের অপরাধ আদালতে প্রমাণ করে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা পুলিসের কাজ। সেই জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ খুঁজে বার করতে যথেষ্ট কর্মকুশলতা এবং বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে জনসাধারণের সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে পুলিস কখনই একাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। এই কাহিনী সংগ্রহে একটি বিষয় ভাল ভাবেই দেখান হয়েছে। তাহল নাগরিক অধিকার রক্ষা ও শান্তির জন্য জন সাধারণের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও সমর্থন কত গুরুত্বপূর্ণ।

আশা করি, অপরাধমূলক ঘটনাগুলির বিবরণ এই ভাবে দেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার ফলে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে পুলিস কর্মচারীদের দিনরাত যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হয় তার কিছুটা আভাস তাঁরা পাবেন। যদি এই বইটি প্রকাশের ফলে পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয় তাহলে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

সূচীপত্র

ভানুমতীর রোষ

ভানুমতীর রোষে কি তালাবন্ধ বাক্স থেকে গহনা লোপাট হতে পারে? গুলবর্গা থানার অফিসারের সামনে এক মহা সমস্যা উপস্থিত।

গুরাপ্পা সাহসে ভর করে থানায় এসে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

—কি ব্যাপার? থানার অফিসার শ্রীরাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

—হুজুর, আমার সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে—ভীত ও কাতর কণ্ঠে গুরাপ্পা নিজের দুঃখের কথা জানাল।

রাজেশ্বর তাকে আশ্বস্ত করে বললেন—স্থির হয়ে আমায় ব্যাপারটা খুলে বল।

—হুজুর, আমি নিজামাবাদে একটা দোকানে কাজ করি। অনেক কাল থেকে আমার বুড়ি মা এখানে একাই থাকে। দিন পনের আগে মা যখন ক্ষেতে গিয়েছিল তখন তাব তালাবন্ধ বাক্স থেকে গয়না আর যা কিছু দামী জিনিসপত্র ছিল সব চুরি হয়ে গেছে।

—থানায় রিপোর্ট লিখিয়েছিলে? রাজেশ্বর প্রশ্ন করল।

—লিখিয়েছিলাম হুজুর, কিন্তু দারোগা সাহেব বলছেন চুরির কোন হদিশই পাওয়া যায়নি।

—ঠিক আছে। তুমি চিন্তা কোরনা, আমি নিজে খোঁজ নিচ্ছি।

রাজেশ্বর এই চুরির মামলায় ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে মজদুর বস্তির দিকে রওনা হলেন।

গুরাপ্পার ঘরে পৌঁছে তার মা গুনদাম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি একাই এখানে থাক?

বুড়ি উত্তর দিল—হ্যাঁ হুজুর।

—পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে এই চুরির ব্যাপারে কারও ওপর তোমার সন্দেহ হয়?

—না হুজুর, এতো ভানুমতী দেবীর কোপ। গুনদাম্মা রাজেশ্বরকে বোঝাবার চেষ্টা করে—আমি গোড়া থেকেই গুরাপ্পাকে এই কথাই বোঝাচ্ছি, কিন্তু ও কিছুতেই মানবে না। আপনিই বলুন দেবীর রোষে যে গয়নাগাঁটি লোপ পেয়েছে তা কি আর ফিরে পাওয়া যায়?

—ঠিক কথা……কিন্তু গয়নাগুলো গেল কেমন করে তা তো বল…… তারপর না হয় দেবীকে প্রসন্ন করার উপায় করা যাবে। রাজেশ্বর বলেন।

—কি আর আপনাকে বলব হুজুর, পুরো এক মাস ধরে আমার ওপর দেবীর কোপ পড়েছে। ঘরে সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার খাটিযার তলায় সিঁদুর মাখানো ফুল, নোংরা চুল, লেবুর টুকরো, ছেঁড়া ন্যাকড়া এইসব পড়ে আছে। তখনই ভয়ে আমার গা কাঁপছিল। য়ল্লামাকে ডেকে এইসব দেখালাম। সেই বলল, কেউ ভানুমতী দেবীর সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্যে এই সব করেছে।

অফিসার প্রশ্ন করলেন—য়ল্লামা কে?

—পাড়াতেই থাকে—গুনদাম্মা বলে।

—তারপর কি হল?

—তারপর আর কি···সেই দিনই আমি য়ল্লামাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গেলাম। দেবীর কোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে পুজো পাঠ করলাম কিন্তু দেবীর দয়া হলনা: বিষণ্ণ গুনদাম্মা বলে।

—তারপর কি হল? উৎসুক হয়ে রাজেশ্বর প্রশ্ন করলেন।

—তারপর আমার পোড়া কপালে যা হবার ছিল তাই হল……দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গুনদাম্মা বলতে থাকে···একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন ক্ষেত থেকে ফিরলাম দেখি দরজার সামনে সিঁদুর পড়ে আছে। দোর খুলে যা দেখলাম তাতে তো আমার চক্ষুস্থির। কাঠের সিন্দুকের ওপর সিঁদুর। ভয়ে ভয়ে বাক্স খুললাম, গয়নার পুঁটলি খুঁজতে লাগলাম……পুঁটলি তো পাওয়া গেল, কিন্তু সেটার ওপরেও সিঁদুর। কাঁপতে কাঁপতে পুঁটলিটা খুলে মাথায় হাত

দিয়ে বসে পড়লাম। দেবীর কোপে আমার গয়নাগুলো সব উবে গেছে। পুঁটলিতে দেখি কেবল ফুল, লেবুর টুকরো, ছাই আর ছেঁড়া হ্যাকড়া।

চুরির বিবরণ দিতে গিয়ে বেচারি কেঁদে আকুল। তার সারা জীবনের সঞ্চয় একদিনে শেষ হয়ে গেছে।

রাজেশ্বর বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কেঁদোনা মা···বল তারপর কি হল।

আমি তখনই ছুটে গিয়ে য়ল্লামাকে ডেকে এনে সব দেখালাম। সে বেচারাই বা কি করবে। সে বলল দেবীর কোপ যখন আমার ওপর পড়েছে তখন মানুষে আর কি করতে পারে······

গুরাপ্পা রেগে বলে উঠল—বাজে কথা রাখ। তোমার গহনা কোন লোকেই চুরি করেছে।

অফিসার চুপ করে একটু ভাবতে লাগলেন চুরির রহস্যটা কি হতে পারে। গুনদাম্মার তো দৃঢ় বিশ্বাস যে গয়নাগুলো দেবীর কোপে উধাও হয়েছে।

গুনদাম্মার প্রতিবেশী য়ল্লমাকে ডেকে পাঠান হল এবং সেও ঠিক গুনদাম্মার কথায় সায় দিয়ে দেবীর কোপের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল।

কথায় কথায় বেশ মিষ্টি করে রাজেশ্বর য়ল্লামাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ওপরেও কি কখনও দেবীর কোপ পড়েছে?

য়ল্লামা উত্তর দিল—আমি প্রত্যহ দেবীকে প্রসন্ন রাখবার জন্যে পূজোআর্চা করি হুজুর।

—অর্থাৎ তোমার ওপর দেবীর কোপ কখনও পড়েনি?

—না ঠিক তা নয়···কয়েক মাস আগে আমার ওপরও দেবীর কোপ পড়েছিল···য়ল্লামা বলে।

—কি করে বুঝলে? রাজেশ্বরের কণ্ঠে দারুণ ঔৎসুক্য।

—একদিন দুপুর বেলা আমি ঘুমিয়েছিলাম···হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, মনে হল কে যেন আমার পিঠে জ্বলন্ত আঙ্গুল রেখেছে। পিঠ জ্বালা করছিল, উঠে

বসলাম। জামাটা খুলে দেখে আমার আর আশ্চর্যের সীমা রইল না, জামাটার পিঠে আট আঙ্গুলের পোড়া ছাপ···এখনও সে জামাটা রাখা আছে।

রাজেশ্বর অবাক হয়ে বললেন—সেটা দেখাতে পার আমায়?

য়ল্লামা উঠে গেল। একটু পরেই একটা জামা হাতে করে ফিরে এল। সত্যই জামাটার পিঠে আটটা ফুটো। সেটা খানিকক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখে রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কেবল এই জামাটাই পরেছিলে? এর নিচে চোলি পরনি?

য়ল্লামা বলে—হ্যাঁ, চোলি পরেছিলাম জামার তলায়, তাতেও ফুটো হযে গিয়েছিল। দেখাতে পার সেটা?

য়ল্লামা আবার নিজের ঘরে গেল এবং অবিলম্বে একটা চোলি হাতে করে ফিরে এল। সেটাতেও আটটা ফুটো। ভাল করে দেখে এবার রাজেশ্বরের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল···ফুটোগুলো মিলিয়ে দেখতেই ভানুমতীর কোপের রহস্য খুলে গেল।

জামা ও চোলির ফুটোগুলি এক জায়গায নয়। রাজেশ্বর বুঝতে পারলেন ভানুমতীর কোপের কাহিনী য়ল্লামার স্বরচিত। গুনদাম্মার গয়না চুরির ব্যাপারে য়ল্লামার হাত আছে।

য়ল্লামাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হল। থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করতে সে কাঁদতে লাগল। বুঝল তার চালাকি ধরা পড়ে গেছে। অগত্যা সে নিজের অপরাধ স্বীকার করল। পুলিসকে জানাল যে সে নিজেই গুনদাম্মার বাক্স খুলে পুঁটলি থেকে গয়না বার করে নিজের উঠানে পুঁতে রেখেছে। যথারীতি উঠানের বিশেষ স্থানটি খুঁড়ে গয়নাও পাওয়া গেল।

অফিসারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলেই চুরির রহস্য ভেদ হল।

নিরুদ্দেশের রহস্য

ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রক থেকে সোভিয়েট রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষার্থে ছাত্র পাঠানোর জন্য মোট তেতাল্লিশ জন ছাত্রকে দিল্লীতে ইণ্টারভিউ-এ ডাকা হয়েছিল—আর তাদেরই মধ্যে একজন ছিল কটকের যোগেন্দ্র নাথ দাস। কটক থেকে ৪ঠা মে রওনা হয়ে সে ৬ তারিখে সন্ধ্যাবেলা দিল্লী পৌঁছে একটা হোটেলে উঠল। নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ৮ তারিখে সে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়ে সেই রাত্রের ট্রেনেই কটক রওনা হয়েছিল। কিন্তু তারপর তার কটকে পৌঁছবার বা তার সম্বন্ধে আর কোন খবরই নেই।

ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রক থেকে সোভিয়েট রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষার্থী নির্বাচনে তার সাফল্যের খবর এসে পৌঁছল তার কটকের ঠিকানায়।

এরপর আরও কদিন কেটে গেল কিন্তু যোগেন্দ্রর দেখা নেই। এ অবস্থায় স্বভাবতই যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন চিন্তিত হয়ে উঠলেন এবং তার বাবা ওড়িষ্যা পুলিসের কাছে ছেলের নিরুদ্দেশের খবর দিলেন।

অবিলম্বে দিল্লী ও ওড়িষ্যার পুলিস অনুসন্ধান আরম্ভ করল। কিন্তু পুরো দুমাস ধরে পুলিসের সব চেষ্টাই বিফল হল। দাসের কোন খবর পাওয়া গেলনা।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আগ্রা থেকে যোগেন্দ্রের নামে কটকে একটা চিঠি এল। ফতেপুর সিক্রী থেকে পরাশর নামে এক কবিরাজ লিখেছেন, "স্থানীয় আগরওয়ালা ধর্মশালায় আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া গেছে। এগুলি কিভাবে আপনার কাছে পাঠান যেতে পারে অনুগ্রহ করে জানাবেন।"

আগ্রা থেকে এই চিঠি পাবামাত্র যোগেন্দ্রের অনুসন্ধানের দায়িত্ব উত্তর প্রদেশের ডিটেকটিভ পুলিসের ওপর দেওয়া হল। অনুসন্ধানের জন্য সি.আই.ডি. ইন্সপেক্টর শ্রী মল্লিক প্রথমেই আগ্রা গিয়ে পরাশর কবিরাজের সঙ্গে দেখা করলেন।

পরিচয়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি যোগেন্দ্রের কাগজপত্র পেয়েছেন ?

পরাশর বললেন—হাঁ, পেয়েছি।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—কিভাবে পেলেন ?

পরাশর তখন সমস্ত বিবরণ দিলেন। মথুরা থেকে একদল বরযাত্রী আগরওয়ালা পঞ্চায়েতী ধর্মশালায় পঁচিশ থেকে সাতাশে জুন অবধি ছিল। ধর্মশালাব একটা ঘরে তাকের ওপর থেকে ঐ কাগজগুলো তারা পায়। তাদেরই মধ্যে একজন কাগজপত্রগুলি তাঁকে দেয়। তারপর তিনি চিঠি দিয়ে দাসকে ঐ সম্বন্ধে জানান।

ইন্সপেক্টর উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বরযাত্রীদের কাছ থেকে দাসের সম্বন্ধে আর কিছু জানতে পেরেছিলেন ?

—না, দাসের সম্বন্ধে বরযাত্রীরা আর কিছুই জানত না। তাছাড়া তারাও আমায় কিছু জানায়নি।

ধর্মশালায় প্রাপ্ত কাগজপত্রের মধ্যে দাসের কিছু সার্টিফিকেট ও ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক থেকে ইন্টারভিউ-এর আমন্ত্রণ পত্র ছিল। কাগজগুলি পাওয়ার ফলে এতটা জানা গেল যে দাস আগ্রায় ছিল কিন্তু আর এমন কোনো সূত্র পাওয়া গেল না যা ধরে পুলিস কোন একটা অনুমানের ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালাতে পারে।

যদি কিছু খবর জানতে পারা যায় এই আশায় ইন্সপেক্টর মল্লিক আগ্রার হোটেল ও ধর্মশালাগুলির রেজিষ্টার দেখতে আরম্ভ করলেন। বেশ কদিন ধরে হোটেলগুলিতে খবরাখবর নিয়েও দাসের হোটেলে থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলনা, কিন্তু কজন লোকের নাম পালাক্রমে বিভিন্ন হোটেল-রেজিষ্টারে পাওয়া গেল। আরও দেখা গেল যে তারা প্রত্যেক বারই রেজিষ্টারে বিভিন্ন ঠিকানা দিয়েছে অথচ তাদের হস্তাক্ষর এক। মল্লিকের সন্দেহ হল। সন্দেহ বশত তিনি দুটি নাম নোট করলেন। এরা দুই থেকে চারদিন করে আগ্রায় বিভিন্ন হোটেলে থেকে গেছে।

মল্লিক দু একদিন আরও খোঁজ খবর নিলেন তারপর তাঁর মনে হল আগ্রা ষ্টেশনে খবর নেওয়া দরকার কারণ দাস আগ্রায় নেমেছিল। আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে রেল কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছুই জানা গেল না। শেষে স্টেশনের ক্লোক রুমের রেজিষ্টার দেখে দাসের সম্বন্ধে আর একটা খবর পাওয়া গেল। রেজিষ্টার অনুসারে দাস মে মাসের ৯ তারিখে সকাল আটটায় নিজের স্যুটকেস ও বিছানা জমা দিয়েছিল এবং সেইদিনই রাত্রি দশটায় নিজের মাল ফেরত নিয়ে যায়। অথচ তার মাত্র আধঘণ্টা পরে আবার সে নিজের স্যুটকেশ জমা দেয় এবং পরদিন অর্থাৎ দশই মে ভোর সাড়ে চারটের সময় সেটা ফেরত নিয়ে যায়। রেজিষ্টারে হস্তাক্ষর দাসের, ঠিকানাও তার কটকের বাড়ীর। দাসের আগ্রায় থাকার আরও একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

রেজিষ্টার দেখে ইন্সপেক্টর মল্লিক বেশ অবাক হলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার মাল জমা দিয়ে দাস পরদিন সকালে তা নিয়ে গেছে এর মধ্যে যেন একটা রহস্য আছে। চিন্তিত হলেন মল্লিক।

দাসের সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও মল্লিক নিরাশ হলেন না। আগ্রার হোটেল রেজিষ্টারগুলো থেকে যে দুটি সন্দেহজনক লোকের নাম নোট করেছিলেন তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। রাজকুমার নামে একজন লোক অম্বিকা হোটেল, শঙ্কর হোটেল এবং মাদ্রাজ হোটেল এই তিনটি হোটেলে থেকেছে। উপরন্তু প্রত্যেকবার হোটেল বদলবার সময় রেজিষ্টারে সে বিভিন্ন ঠিকানা দিয়েছে। হোটেলগুলো থেকে তার চেহারার যে বিবরণ পাওয়া গেল তাতে জানা গেল তার সামনের দুটো দাঁত নেই। অবিলম্বে রাজকুমারের গতিবিধির ওপর পুলিস নজর রাখল। তৃতীয় দিনে আগ্রা ষ্টেশনে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে রাজকুমারকে গ্রেপ্তার করা হল। সার্চ করে তার কাছে একটা ঘড়ি, ফাউটেন পেন; আংটি ও নগদ বেশ কিছু টাকা পাওয়া গেল। রাজকুমারের পকেটে একটা খামে মিহি গুঁড়ো কিছুটা পাওয়া গেল এবং পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা ধুতুরার গুঁড়ো।

মালসমেত ধরা পড়ায় রাজকুমার বুঝল পুলিসের হাত থেকে আর রেহাই নেই। সে নিজের স্বীকারোক্তিতে বলল যে সে গাইডের ছদ্মবেশে আগ্রার বহু যাত্রীর মাল সরিয়েছে। পয়সাওয়ালা লোকেদের সঙ্গে সে ষ্টেশনেই পরিচয় করে ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখাতে নিয়ে যায়, তারপর কোন এক অবসরে যাত্রীকে ধুতুরার গুঁড়ো খাইয়ে অজ্ঞান করে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে সরে পড়ে।

রাজকুমারের গ্রেপ্তারের ফলে বেশ কয়েকটা খুন ও চুরির মামলার সুরাহা হয়ে গেল কিন্তু দাসের ব্যাপারটা তখোনো অন্ধকারেই রইল।

পুলিস অফিসার রাজকুমারকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—নিজের অপরাধ তুমি স্বীকার করেছো বটে কিন্তু এখনও অনেক কথাই লুকোচ্ছো।

রাজকুমার নিজের সাফাই দিয়ে বলল—লুকিয়ে আর আমার লাভ কি? আমি আপনাদের সব কথাই বলেছি এবং নিজের অপরাধের সাজা পেতে প্রস্তুত।

—এটা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে এসব কাজে একা তোমার হাত ছিল? আর কেউ ছিলনা তোমার সঙ্গে? পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করেন।

রাজকুমার চুপ। সে খানিকটা নির্বিকারভাব দেখাতে চেষ্টা করল। তার মনোভাব বুঝে অফিসার আবার বললেন—আমরা খবর পেয়েছি, এসব অপরাধে অন্যের যোগসাজস আছে...তাদের সম্বন্ধে নিজের বয়ানে তুমি কিছুই বলনি।

আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়...রাজকুমার ভাবল পুলিস যখন তার সব কথাই জানে তখন সব কিছু খুলে বলা ছাড়া উপায় কি? সে তখন ভয়ে ভয়ে বলল—আর আমি কিছু লুকোতে চাইনা হুজুর, আমার আর একজন সঙ্গী আছে.........

—কে?

—হিমাচল প্রদেশের বলদেব রাজ।

নামটা জানবার পরই হিমাচল রাজ্যের ছোট একটি গ্রামে পুলিস বলদেব রাজকে গ্রেপ্তার করল। তার ঘর সার্চ করে কয়েকটা ঘড়ি, ক্যামেরা এবং দাসের স্যুটকেসটা পাওয়া গেল। স্যুটকেসের ওপর যোগেন্দ্র নাথ দাসের পুরো নাম আর আগ্রা ষ্টেশনের ক্লোক রুমের টিকিট ঝুলছিল।

মাল সমেত ধরা পড়ার পর বলদেবের অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া আর কোন পথ রইল না। নিজের বয়ানে সে বলল—মে মাসের ৯ তারিখে দিল্লী যাবার জন্য আমি আগ্রা ষ্টেশনে যাই, সেইখানেই দাসের সঙ্গে আমি আলাপ করি। তাকে বলেছিলাম—আমি সৈন্য বিভাগে কাজ করি ও কলকাতা যাচ্ছি। সে রাত্রে আগ্রা ষ্টেশনে আমি দাসের সঙ্গেই ঘুমিয়েছিলাম, পরদিন সকালে তার হোল্ডলের মধ্যে আমি নিজের ব্যাগটা বাঁধিয়ে দিলাম তারপর মাল ক্লোক রুমে রেখে আগ্রা দেখাবার ছলে তাকে সহরে নিয়ে গেলাম। সহরের এক দোকানে চা জলখাবার খাবার সময় আমি তার খাবারে ধুতরোর বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। সে যখন অজ্ঞান হয়ে গেল তখন আমি তার পকেট থেকে মনিব্যাগ, হাত ঘড়ি খুলে নিয়েছিলাম। তারপর তাকে সরোজিনী হাসপাতালে ছেড়ে আমি সোজা ষ্টেশনে গেলাম, মালপত্র ছাড়িয়ে নিয়ে ফতেপুর সিক্রীর ধর্মশালায় সারাদিন কাটিয়েছিলাম। দাসের ঘড়ি এবং অন্য কিছু জিনিষ আমি আগ্রাতেই বিক্রী করে দিয়েছিলাম।

প্রায় এক বছর ধরে পুলিস অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর দাসের হত্যাকারীদের ধরতে সমর্থ হল। এই মামলায় ধরা পড়া দুই আসামীর স্বীকারোক্তিতে আরও কয়েকটা খুন ও জুয়াচুরির মামলার সুরাহা হল। আসামী বলদেব রাজকে যোগেন্দ্রের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হয় ও বিচারে তার আ-জীবন কারাদণ্ড হয়, হাইকোর্টেও তার আপিল অগ্রাহ্য হয়েছিল।

টেলিফোন মেকানিক

সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেবার পর জনাব হাবিব মোহম্মদ হায়দ্রাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন স্থির করেন। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শেষ করে চাকরী করছে কাজেই স্বামী-স্ত্রী শেষ জীবনটা শান্তিতে হায়দ্রাবাদে কাটাচ্ছেন। রেড হিল্‌সে একটি ছোট বাংলো ভাড়া নিয়ে তাঁরা থাকেন।

গরমকালের দিন। সকালে বারান্দায় বসে মোহম্মদ সাহেব খবরের কাগজ পড়ছেন। এমন সময় সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে একটি লোককে গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরে আসতে দেখা গেল। কাগজ থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই ?

—আপনার টেলিফোন ঠিক করতে এসেছি।

টেলিফোনের কথা কানে যেতে মিসেস হাবিব বাইরে এসে বললেন—এই একটু আগেই তো আমি টেলিফোনে কথা বলেছি······টেলিফোন তো ঠিকই

হাবিব মহম্মদ ড্রইং রুমে গিয়ে টেলিফোন ডায়েল করে কথা বলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সেটা বাস্তবিকই খারাপ দেখা গেল। লাইনম্যানকে ঘরের মধ্যে ডেকে বলসেন—ভেতরে এস, টেলিফোন কাজ করছে না।

লাইনম্যান তার যন্ত্রপাতির থলি নিয়ে ঘরে এল। এক কোনে টেবিলের ওপর টেলিফোনটা রাখা ছিল। থলি থেকে প্যাঁচকস ও আরও কিছু যন্ত্রপাতি বার করে সে টেলিফোনের তার ইত্যাদি ঠিক করতে লাগল। মোহম্মদ সায়েব সেই ঘরেই চেয়ারে বসে কাগজ দেখতে লাগলেন। একটু পরে কাজ করতে করতে লাইনম্যান বলল—আপনার টেলিফোনের কানেক্‌শন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল আমি ঠিক করে দিয়েছি······এবার আমায় একটু নুন এনে দিলে একেবারে ঠিক হয়ে যাবে।

—নুন ? হাবিব সাহেব অবাক হয়ে গেলেন।

—হাঁ নুন···টেলিফোন ঠিক করতে নুনও দরকার হয়···লোকটা জোর দিয়ে বলল।

—বেশ, আমি ভেতর থেকে নুন এনে দিচ্ছি। বলে তিনি ভেতরে নুন আনতে গেলেন, লাইনম্যান ঘরের মধ্যেই টেলিফোন ঠিক করতে লাগল। মোহম্মদ সাহেব যখন নুন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন লাইনম্যান বলল :

—থাক্, নুন আর দরকার হবেনা, আপনার টেলিফোন ঠিক হয়ে গেছে। এবার আপনার অনুমতি পেলে আমি যেতে পারি, অনেকগুলো টেলিফোন ঠিক করতে হবে······

লোকটা এই বলে সাইকেলে নিজের থলি ঝুলিযে চলে গেল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে স্ত্রীকে ডাকলেন মোহম্মদ সায়েব :

—বেগম······আমার চামড়ার ব্যাগটা কোথায় ?

—আমি জানিনা তো······ওইখানেই কোথাও আছে দেখ······স্ত্রী পাশের ঘর থেকে বললেন।

মোহম্মদ সাহেব ঘরে এটা ওটা সরিয়ে ব্যাগ খুঁজতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ঘরে এসে বললেন—তুমি নিজের জিনিষপত্র যেখানে সেখানে রেখে ভুলে যাও আর আমায় ডাকাডাকি কর···এই ড্রইং রুমেই তো ব্যাগ রাখা ছিল।

—কিন্তু সেটা গেল কোথায় ? রাগ করে বললেন—আমার টাকার ব্যাগ, চশমা, ফাউন্টেন পেন সবই তো ঐ চামড়ার ব্যাগে······

সারা ঘর খুঁজে ব্যাগ পাওয়া গেল না। মোহম্মদ সাহেব বেগমকে বললেন—সকাল পর্যন্ত ব্যাগটা এই ঘরেই ছিল···গেল কোথায় ?

—সকাল থেকে কোন বাইরের লোকই তো ঘরে ঢোকেনি···টেলিফোনের লাইনম্যান অবশ্য ঢুকেছিল···বেগমের কণ্ঠস্বর চিন্তান্বিত।

—কিন্তু আমি তো সামনের ঘরেই ছিলাম—তারপর একটু থেমে গেলেন—তবে সে নুন চাইতে আমি একটু ভেতরে গিয়েছিলাম। ঐ সময়টা

সে একা এই ঘরে ছিল···মনে হচ্ছে ঐ লোকটারই কাজ···ব্যাগটা সরিয়েছে সেই সময়।

হাবিব সায়েব টেলিফোন মেরামত বিভাগ থেকে লোকটার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার জন্য টেলিফোন তুলে দেখলেন টেলিফোন ডেড্ হয়ে আছে। পাড়াতেই আর এক বাড়ী থেকে টেলিফোন করে জানা গেল যে টেলিফোন ঠিক করবার জন্য কোন লোককেই তারা পাঠায়নি। এবার সবই স্পষ্ট হয়ে গেল যে লোকটা নকল লাইনম্যান সেজে চুরি করতে এসেছিল। অবিলম্বে থানায় রিপোর্ট দিতে এলেন হাবিব মোহম্মদ।

হাবিব সায়েব নামপালী থানায় যখন পৌছলেন তখন বেলা আড়াইটা। ইন্সপেক্টর রেড্ডী চুরির পূর্ণ বিবরণ শুনে বললেন—আশ্চর্য, ঠিক এই ভাবে সম্প্রতি আরও অনেকগুলো চুরি হয়েছে, কিন্তু চোর ধরাই যাচ্ছে না।

-—এইভাবে চুরির কেস আরও আছে নাকি? হাবিব সায়েব অবাক!

—তিনটে চুরি ঠিক এইভাবে হয়েছে···টেলিফোন ঠিক করার ভান করে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে ঘড়ি, ক্যামেরা, পেন এইরকম সব দামী জিনিস নিয়ে সরে পড়েছে।

অফিসারকে বেশ একটু চিন্তান্বিত দেখা গেল, জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনি লোকটার জামাকাপড় বা চেহারার কোন বিশেষত্ব মনে করে বলতে পারেন।

—নিশ্চয়, হাবিব মোহম্মদ উত্তর দিলেন···লোকটা টেলিফোন লাইনম্যান-এর পোষাকেই এসেছিল, তার হাতেও যন্ত্রপাতির একটা থলি ছিল।

—চেহারা কেমন?

—ময়লা রং, বাইশ তেইশ বছরের যুবক। তেলুগু বলছিল, সামান্য ইংরেজীও বলতে পারে।

—দেখালে চিনতে পারবেন লোকটাকে?

—নিশ্চয়!

—বেশ, আমরা তাকে ধরতে চেষ্টা করছি, প্রয়োজন হলে আপনাকে কষ্ট দেব

অফিসার এমন কোন সূত্রই পেলেন না যাতে অপরাধী সম্বন্ধে অন্তত কিছু অনুমান করে অনুসন্ধান করতে পারা যায়। হায়দ্রাবাদের টেলিফোন বিভাগে অনুসন্ধান করবেন ঠিক করলেন।

মিঃ রেড্ডী টেলিফোনের অ্যাসিষ্টেণ্ট এঞ্জিনিয়ারের অফিসে গেলেন। সে ভদ্রলোক পুলিস অফিসারকে বসতে অনুরোধ করে বললেন—কষ্ট করে যখন এসেছেন, মনে হচ্ছে বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

—খুবই জরুরী ব্যাপারে একটু সাহায্য চাই।

—বলুন।

—সম্প্রতি সহরে অনেকগুলো চুরি হয়েছে। চুরির কায়দা বেশ নতুন ধরনের। একটা বাইশ তেইশ বছরের লোক টেলিফোন মেকানিক সেজে বাংলোগুলোর মধ্যে ঢোকে এবং কিছু না কিছু দামী জিনিস চুরি করে সরে পড়ে।

—তাই নাকি ? অ্যাসিষ্টেণ্ট এঞ্জিনিয়ার অবাক হয়ে যান।

—আমার অনুমান এই চুরির ব্যাপারে এমন কোন লোক জড়িত আছে যে টেলিফোনের কাজ খানিকটা জানে।

—আপনার অনুমান সত্য হতে পারে।···কিন্তু এই চুরির মধ্যে আমাদের কোনো কর্মচারীর হাত আছে তা আমার মনে হয়না।

—আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি বলতে চাইছি সম্ভবত আপনাদের বরখাস্ত করা কোন লোক এইভাবে চুরি করছে। এখানে কাজ থেকে যাদের ছাড়ানো হয়েছে তাদের কোন রেজিষ্টার দেখাতে পারেন ?

—সেটা দেখাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি বলছেন বাইশ তেইশ বছরের যুবক। আমাদের এখান থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

—কোন অল্পবয়স্ক কর্মচারীকে কি কখনও বরখাস্ত করা হয়নি ?

এঞ্জিনিয়ার একটু ভেবে বললেন—মনে আছে গত বছর একজন অস্থায়ী কর্মচারীর কাজ সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে জবাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে সব ফাইল দেখলে তবেই আপনার কাজের সুবিধা হতে পারে……

রেড্ডী বরখাস্ত কর্মচারীদের ফাইল দেখা শুরু করলেন। অনেকেরই বয়স বেশী, চেহারাও অন্য রকম। কিছুটা নিরাশ হয়ে তিনি বললেন—এদের মধ্যে সন্দেহজনক বলে তো কাউকেই মনে হয়না।

—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি এসব চুরিতে আমাদের এখানকার কোন কর্মচারীর হাত থাকা সম্ভবপর নয়।……একটু ভেবে আবার বললেন—তবে মাস দুই আগে দুজন লোককে ছাড়িয়ে দেওযা হয়েছিল…কিন্তু তাদের ওপরই বা সন্দেহ কি করে করা যায়?

রেড্ডী তাদের ফাইলগুলো দেখতে চাইলেন।

ফাইল দেখে পুলিস ইন্সপেক্টারের টনক নড়ল। জিজ্ঞাসা করলেন—শঙ্কর রাওকে বরখাস্ত কবা হয়েছিল কেন বলুন তো?

—প্রথমত তার কাজ সন্তোষজনক ছিল না, তার ওপর তার কথাবার্তা চালচলন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিযোগ এসেছিল। কিন্তু তাকে সন্দেহ করা বৃথা, তার বড় ভাই অনেক দিন ধরে এখানে লাইনম্যানের কাজ করে। আমি তাকেই এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি, আপনি তাকে শঙ্কর রাও সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

—শঙ্কর রাও-এর কোন ফটো পাওয়া যাবে? রেড্ডী প্রশ্ন করলেন।

—এখানে নেই, কিন্তু প্রাক্তন অ্যাসিষ্টেন্ট এঞ্জিনিয়ারের ফেয়ারওয়েল পার্টিতে সব কর্মচারীই যোগ দিয়েছিল, সেই সময় একটা গ্রুপ ফটো রয়্যাল ষ্টুডিয়োকে দিয়ে তোলান হয়েছিল। আমার মনে হয় শঙ্কর রাও-এর ফটোও তাতে পাবেন।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে শঙ্কর রাও-এর বড় ভাই ঘরে ঢুকল। রেড্ডী জিজ্ঞাসা করলেন—শঙ্কর রাও তোমার ভাই?

—হ্যাঁ।

—এখন সে কোথায় ?

—তার ঠিকানা আমি জানি না।

—তোমার সঙ্গে কি সে থাকে না ?

—মাঝে মাঝে আসে, দুচার দিন থাকে···। যবে থেকে চাকরী গেছে সে এক জাযগায থাকে না।

ইন্সপেক্টরের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হল, তিনি তাকে যেতে বললেন। শঙ্কর রাও-এর ভাই কামরা থেকে চলে যাবার পর রেড্ডী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অ্যাসিষ্টেণ্ট এঞ্জিনিযারের দিকে তাকালেন, বললেন—কি মনে হয় আপনার ?

—কিছু বুঝলাম না।

রেড্ডী একটু হেসে বললেন—এর কথা শুনে শঙ্কর রাও-এর ওপর সন্দেহ আমার আরও বেশী হচ্ছে······। যাই হোক দেখা যাক···আচ্ছা এবার অনুমতি দিন, আমি চলি। হয়তো আবার আপনাকে কষ্ট দিতে হতে পারে।

—রেড্ডী এবার সোজা রয়্যাল ষ্টুডিয়োতে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে গ্রুপ ফটো পেতে কোন অসুবিধা হলনা। সেটা নিয়ে অবিলম্বে রেড্ডী হাবিব মোহম্মদের বাড়ী গেলেন। ছবিখানা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এই গ্রুপের মধ্যে কোনও লোককে আপনি চিনতে পারেন কি না দেখুন তো।

বেশ মন দিয়ে খানিকক্ষণ দেখে হাবিব সাহেব বলে উঠলেন—এইতো সেই লোকটা···।

—কোন লোকটা ? রেড্ডী উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করেন।

গ্রুপের সবচেয়ে পিছনের সারিতে দাঁড়ানো একটা লোককে দেখিয়ে হাবিব মোহম্মদ বললেন—এই লাইনম্যানই আমার টেলিফোন ঠিক করতে এসেছিল।

মিসেস হাবিবও ছবি দেখে লোকটাকে চিনতে পারলেন—তাই তো, এই লোকটাই সেদিন ফোন ঠিক করতে এসেছিল।

রেড্ডীর অনুমানই ঠিক, বেশ সন্তুষ্ট হলেন তিনি। শঙ্কর রাও-এর কাজ······এইসব চুরি······। কিন্তু লোকটাকে ধরা খুব সহজ হবে না কারণ

তার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। মাঝে মাঝে দুচার দিন হায়দ্রাবাদে ভাইয়ের কাছে আসে।

রেড্ডী শঙ্কর রাও-এর বাড়ীর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং সে সহজেই ধরা পড়ল। অপরাধের স্বীকারোক্তি পেতেও বিশেষ দেরী হলনা। এইভাবে সে চোদ্দটা চুরি করেছে···চুরির মালও তার দেখানো জায়গা থেকে উদ্ধার হল। শঙ্কর রাও-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল এবং প্রত্যেকটা চুরির জন্যই তার কারাদণ্ড হল।

পুরানো খবরের কাগজের সূত্র

—দারোগা বাবু……দারোগা বাবু……লাশ……লাশ……

ইণ্টৌজা থানার সামনে কয়েকখানা চেয়ার পাতা। শীতের দিন দারোগা বাবু রোদ পোয়াচ্ছেন। তাঁর সামনে মুন্সী, দুজন কনষ্টেবল এবং গ্রামের দু এক জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোন একটা মামলার ব্যাপারে কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময় বেশ জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা দারোগাকে ঐ খবর দিল।

দারোগা বললেন—আরে বাপু, একটু ঠাণ্ডা হও…এত ঘাবড়াবার কি আছে? ঠিক করে বল…লাশ কোথায় দেখলে?

—হুজুর আমি সাইকেলে দিগোয়া জঙ্গলের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রস্রাব করতে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে একটা ঝোপের দিকে যাচ্ছি…দেখি কম্বলমোড়া কি পড়ে আছে…কাছে গিয়ে দেখি কম্বলের মধ্যে থেকে একটা পা বেরিয়ে আছে—রক্তমাখা। দেখেই আমি সাইকেল নিয়ে আপনাকে খবরটা দিতে এলাম।

—সাবাশ…খুব ভাল কাজ করেছ…চল আমি তোমার সঙ্গে এখনই যাচ্ছি সেখানে।

দারোগা নিজের সাইকেল বার করালেন এবং আর জনকয়েক কনষ্টবলকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হলেন।

দারোগাকে সদলবলে যেতে দেখে অবিলম্বে খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়ল…দিগোয়া জঙ্গলে লাশ পাওয়া গেছে।

দারোগা পৌঁছবার আগেই সেখানে একটা ছোটখাট ভিড় জমে গেল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে লোকেরা চাপা গলায় কথাবার্তা বলছিল। দারোগা ও তাঁর সঙ্গীরা নিজেদের সাইকেল গাছে ঠেস দিয়ে রেখে ঝোপের দিকে গেলেন…

কম্বলে জড়ান লাস পড়ে আছে। লোকটি যেমন বলেছিল ঠিক তাই···কম্বলের মধ্যে থেকে একখানা পা বেরিয়ে আছে···কম্বলে রক্তের দাগ, মাছি ভন ভন করছে। দারোগা কম্বল সরিয়ে দেখলেন পুরুষের মৃতদেহ। পেটে দুটি গভীর ক্ষতচিহ্ন, একটা ক্ষতস্থানের মুখে খবরের কাগজ ঠুসে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা হয়েছে, তেলের বোতলের মুখে লোকেরা যেমন করে কাগজ ঠুসে বন্ধ করে ঠিক সেই ভাবে।

দারোগা সবাইকে ডেকে লাশ সনাক্ত করতে বললেন। কয়েকজন সাহস করে এগিয়ে গেল, বাকীরা ইতস্তত করতে লাগল। লাশ দেখে চাপা গলায় দু একটা কথা বলে সবাই চুপ। হয় লাশ চিনতে পারেনি আর না হয় চিনতে পেরেও বলবার সাহস পাচ্ছে না।

এমন সময় ভিড়ের পিছনে একটা গোলমাল শোনা গেল। একটি স্ত্রীলোক সম্ভবত এগিয়ে আসতে চাইছিল কিন্তু সবাই তাকে বাধা দিয়ে বলছিল, মেয়েদের ওখানে যাবার দরকার নেই। দারোগা তাকে ডাকলেন, যদি চিনতে পারে মৃত লোকটিকে। দারোগার খাতিরে সবাই তাকে পথ করে দিল। একটি স্ত্রীলোক মাথায় অল্প ঘোমটা দিয়ে এগিয়ে এল। কাছে এসে লাশ দেখেই সে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো।

দারোগা তাকে অনেক করে সান্ত্বনা দিয়ে একটু শান্ত করে তার নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। জানা গেল তার নাম মঙ্গলা, সে এখান থেকে দু মাইল দূরে ইন্দৌরা গ্রামে থাকে। কেঁদে কেঁদে বেচারী বলতে থাকে, তার স্বামী তিনদিন আগে কাজে গিয়েছিল তারপর আর ফেরেনি। জঙ্গলে লাশ পড়ে থাকার খবর শুনে সে এখানে দৌড়ে এসেছে এবং যা ভয় করেছিল তাই হয়েছে···লাশটা তার স্বামীর। গ্রামের আরও দুচার জন মঙ্গলার সঙ্গে এসেছিল, তারাও লাশ সনাক্ত করল। লাশ মঙ্গলার স্বামী শ্রীরামের।

দারোগা জানতে চাইলেন শ্রীরাম কোথায় কি কাজ করত।

উত্তরে মঙ্গলা বলল যে শ্রীরাম কাছেই সরকারী চামড়া কারিগরী শিক্ষা

কেন্দ্রে রান্নার কাজ করত। ভোরবেলা কাজে যেত এবং সেখানে শিক্ষার্থীদের রাতের খাওয়া দাওয়া সব শেষ হলে বাড়ী ফিরতে তার বেশ রাত হয়ে যেত। তিনদিন আগে সে যথারীতি কাজে গিয়েছিল, রাতে ফিরল না।

দারোগা প্রশ্ন করলেন—তুমি পরদিন খোঁজ নাওনি?

—না হুজুর, আমি ভেবেছিলাম রাত বেশী হয়ে যাওয়াতে সে বাড়ী আসতে পারেনি, পরদিন আসবে।

—তার পরের দিনও খোঁজ নাওনি?

—করেছিলাম হুজুর। আমি স্কুলে গিয়ে ঠিকেদারকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল শ্রীরাম তার একশ পঁচিশ টাকা চুরি করে দুদিন হল পালিয়ে গেছে।

দারোগার মনে তখনই একটা সন্দেহ হল…টাকা চুরি করে শ্রীরাম পালিয়েছে অথচ ঠিকেদার পুলিসে রিপোর্ট দেয়নি কেন? চামড়া কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে খবর নেওয়া দরকার। দারোগা লাশটা ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন, লাশ জড়ান কম্বলটা আর পেটের ক্ষত স্থানটীর মুখ বন্ধ করা খবরের কাগজের টুকরোটা সেখানেই কয়েকজন লোকের সামনে সীল করে থানায় পাঠিয়ে দিলেন।

দিনটা রবিবার, শিক্ষা কেন্দ্রের অফিস বন্ধ, ক্যান্টিনও বন্ধ। তবে ওখানে যারা ছিল তাদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল ঠিকেদারের নাম শিবলাল। ক্যান্টিনের পাশের ঘরে থাকে সে। ঘরটা দেখতে গেলেন দারোগা কিন্তু তালাবন্ধ ছিল। নিরুপায় হয়ে ফিরলেন তবে একটা লোককে ঘরটার ওপর নজর রাখবার জন্য রেখে এলেন।

পরদিন আবার দারোগা গেলেন শিক্ষাকেন্দ্রে, শিবলাল সেদিনও অনুপস্থিত। কেন্দ্রের এক শিক্ষার্থী গোপালের সঙ্গে তাঁর অল্প পরিচয় ছিল। তার ঘরে গেলেন। গোপাল দারোগাকে ডেকে বসিয়ে বলল—আসুন দারোগা বাবু…কি মনে করে এদিকে আসা হল? বসুন…জল টল খান।

—শুধু জল। না আর কিছু খাওয়াবে? হাসতে হাসতে বললেন দারোগা।

—কী আর বলব বাবু, আমি সত্যই বড় লজ্জিত, এখানকার খাওয়া দাওয়া একেবারেই খারাপ···কিছুই পাওয়া যায় না।

—কেন? ক্যান্টিন নেই নাকি?

—তা আছে, তবে সেটা একটা ঠিকেদারের হাতে। শিবলাল লোকটা বড় জোচ্চর···এত খারাপ খাবার দেয় যে কি বলব······

দারোগা বললেন—শিবলালকে একটু ডেকে পাঠাও এখানে। তাকে একটা ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

—কি ব্যাপার বাবু?

—শ্রীরাম বলে একটা লোক এখানে রান্না করে···সে শিবলালের কিছু টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

—তাই নাকি? তাই দু তিন দিন থেকে ক্যান্টিনে শ্রীরামের দেখা পাওয়া যায়নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঠিকেদার বলল শালা র‍্যাশন চুরি করত তাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। সবাই বলল দু তিন দিন আগে শ্রীরামের সঙ্গে ঠিকেদারের নাকি খুব ঝগড়া হয়েছিল।

দারোগার সন্দেহ বাড়ল। শ্রীরামের স্ত্রীর কাছে এক রকম বলেছে ঠিকেদার, আবার গোপালকে বলেছে আর এক রকম···কেন? দারোগা বললেন—ঠিকেদারকে ডাক, তার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।

গোপাল ডাকতে গেল কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে খবর দিল যে দু তিন দিন ধরে ঠিকেদারের কোন পাত্তাই নেই, তার চাকর ছেদা ক্যান্টিনের কাজ চালাচ্ছে।

দারোগা শিক্ষা কেন্দ্রের দু তিনজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ঠিকেদারের ঘরের তালা ভাঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। ঘরের একদিকে জিনিষপত্র রাখবার জন্য পাঁচ ফুট উঁচু একটা বেদীর মত, কিন্তু তার ওপর কিছুই রাখা নেই। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলনা। ঘরের এক কোনে কিছু পুরানো খবরের কাগজ রাখা ছিল। দারোগা

কিছু লোককে সাক্ষী রেখে ঐ কাগজগুলো বেঁধে সীল করে দিলেন। এছাড়া আর কোন কিছুই পাওয়া গেলনা।

তবে ঘরে ঢুকেই দারোগার কেমন একটা খটকা লেগেছিল। খুব মন দিয়ে ঘরখানা দেখছিলেন। হঠাৎ যেন একটা রহস্যের সন্ধান পেলেন। ঘরের দেওয়াল ছাদ সবই মলিন কিন্তু বেদীটা নতুন চুনকাম করা হয়েছে, পরিষ্কার ঝকঝক করছে।

দারোগা জানতে চাইলেন কেন্দ্র ভবনের চুনকাম কবে হয়েছে।

—কয়েক মাস আগে।

দারোগা বললেন—কিন্তু ঐ বেদীটায় তো খুব সম্প্রতি চুন কলি ফেরান হয়েছে দেখছি···কে করিয়েছে ?

এবার উপস্থিত সকলেরই চোখ পড়ল বেদীটার ওপর। সত্যই চুনকামটা নতুন কিন্তু কে করেছে তা কেউ বলতে পারল না। জমাদার কৌতুহল বশে সেখানে উপস্থিত ছিল সব কথা শুনছিল সে। এবার সে দারোগাকে জানালো—শিবলাল নিজে আর তার চাকর ছেদা দুজনে মিলে চুনকাম করেছে।

দারোগা যেন নিজের সন্দেহের ভিত্তি দেখতে পেলেন। তাঁর মনে তখনই ঘটনাটির একটা ছবি ভেসে উঠল···কিন্তু সবচেয়ে আগে চাই প্রমাণ···প্রমাণ কোথায় ?

ঠিকেদারের চাকর ছেদাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে হাজতে রাখা হল। ঘরখানা পরীক্ষা করবার জন্য সদরে পুলিসের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিভাগের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তারা এসে বেদীটার ওপরকার নতুন চুনকাম চেঁছে রাসায়নিক পরীক্ষা করলেন। চুনকামের নীচে মানুষের রক্ত।

লাশের পেটের ক্ষত থেকে রক্ত বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে ঠুসে দেওয়া ছেঁড়া খবরের কাগজের সঙ্গে কামরার মধ্যে রাখা ছেঁড়া খবরের কাগজ মেলাতে স্পষ্ট দেখা গেল রক্তমাখা কাগজটা আর কামরায় রাখা কাগজের ছিন্ন অংশ—এই দু টুকরো বেমালুম মিলে গেল !

খুনের সমস্ত প্রমাণই পাওয়া গেল। ঠিকেদার শিবলাল আর তার চাকর ছেদা শ্রীরামকে হত্যা করে তার লাশ বেদীটার ওপর রেখেছিল তারপর রাত্রে এক সময় সরিয়ে জঙ্গলে ফেলে আসে। শ্রীরামের ক্ষতস্থল থেকে রক্ত বন্ধ করবার জন্য খবরের কাগজ ছিঁড়ে ঠুসে দেয়। তারপর রক্তের দাগ নিশ্চিহ্ন করবার জন্য ধুয়ে মুছে বেদীটা নতুন করে চুনকাম করে দিয়ে ভেবেছিল হত্যার সমস্ত প্রমাণই তারা নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দক্ষ পুলিস অফিসারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়ানো গেলনা। তিনি নতুন চুনকামের রহস্য ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় চুনের তলায় রক্ত থাকায় তাঁর সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হল। খবরের কাগজের টুকরো দুটি বাকী সন্দেহটুকুও স্পষ্ট প্রমাণিত করে দিল।

দু সপ্তাহ পরে শিবলালকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হল। তার ও তার চাকর ছেদার ওপর খুনের অভিযোগ আনল পুলিস। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণগুলির সাহায্যে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হল ও উপযুক্ত সাজা পেল। হাইকোর্টে শিবলালের ফাঁসির সাজা হয় কিন্তু ক্ষমার আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় ফাঁসির বদলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ছেদা নির্দোষ প্রমাণিত হয় ও খালাশ পায়।

কাঁচের টুকরো

ডিসেম্বরের আট তারিখে প্রধান বিচারপতি এইচ. এন. সান্যাল তাঁর নয়া দিল্লীর সরকারী বাসভবনে খুন হয়েছেন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আকবর রোডের বাড়ীতে পুলিস অফিসার, প্রেস রিপোর্টার এবং বহু গণ্যমান্য লোকের ভিড় জমে গেল। এর পূর্বে আর কখনও রাজধানীতে এত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির এভাবে মৃত্যু হয়নি। সারা সহর তোলপাড় হয়ে গেল।

দিল্লীতে সান্যাল সায়েব একাই থাকতেন, পরিবারবর্গ থাকতেন কলকাতায়। যথারীতি সে রাত্রেও তিনি একাই নিজের ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় তাঁর চাকর দিলীপ ঘুমিয়েছিল। মাঝরাত্রে বারান্দায় বাঁধা কুকুরের চিৎকারে দিলীপের ঘুম ভাঙ্গতে সে উঠে বসে। সান্যাল সায়েবের ঘরের মধ্যে হুটোপাটি ও কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পায়। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে ঘরের মধ্যে চারজন লোক—তাদের মধ্যে দুজন সান্যাল সায়েবকে খাটের ওপর চেপে ধরে আছে। ভয় পেয়ে দিলীপ চিৎকার করে ওঠে—বাঁচাও বাঁচাও। তার চিৎকারে লোকগুলো পালিয়ে যায়। খুন করার উদ্দেশ্যে লোকগুলো একটা ধুতি দিয়ে সান্যাল সায়েবের গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিয়েছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান।

দিল্লী পুলিসের কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল রুমে মাঝরাত্রে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছবামাত্র পুলিস সান্যাল সায়েবের বাড়ীতে এসে পৌঁছায়।

বলা বাহুল্য এই হত্যাকাণ্ড পুলিসের পক্ষে খুব বড় রকমের একটা পরীক্ষা।

ঘটনাস্থলের প্রত্যেকটি জিনিষই খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল ঘর থেকে কিছুই চুরি হয়নি অথবা কোন তালা ভাঙ্গা নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা লোহার আলমারীতে হাজার হাজার টাকা ছিল তা পর্যন্ত যেমনকার তেমন

রাখা ছিল। এইজন্যই সান্যাল সায়েবের হত্যাটা আরও রহস্যজনক বলে মনে হল এবং পুলিসের পক্ষেও কোনো সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালান আরও কঠিন হল।

শোবার ঘরে কাপড়ের একটা থলি পাওয়া গেল, তাছাড়া চাবির একটা গোছা আর একখানা ছোট তোয়ালে পাওয়া গেল। বোঝা গেল তাড়াতাড়িতে লোকগুলো এ কটা জিনিস নিয়ে যেতে পারেনি। খাটের পাশে টেবিলের ওপর কাঁচের একটা জাগ ছিল এবং গ্লাসের টুকরো সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিল। এছাড়া গেটের বাইরে পুলিস একটা চটি এবং একটা জুতো পড়ে থাকতে দেখেছিল। অনুসন্ধানের জন্য এই সব জিনিসই যত্ন করে রাখা হল।

হত্যাকারীদের সম্বন্ধে আর কোন সূত্র পুলিস খুঁজে পেল না। বাড়ীর চাকরবাকর ও সান্যাল সায়েবের পরিচিত কয়েকজন লোককে পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল।

পুলিসের বড় অফিসার সান্যাল সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার সিংহকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—এ খুনের কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন ?

—এই ভয়ানক ব্যাপারে আমি নিজেই বিমূঢ় হয়ে গেছি। সান্যাল সায়েবকে খুন করার উদ্দেশ্য কি বা এতে কাদের হাত আছে তা আমি ভেবেই পাচ্ছিনা। খুবই বিমূঢ় ভাবে মিষ্টার সিংহ বললেন।

—তবু···আপনি তো সান্যাল সায়েবের খুবই কাছে থাকতেন, তাঁর সম্বন্ধে আপনার অনেক কিছুই জানা···। ইতিমধ্যে কি এমন কিছু ঘটেছিল যাতে খুনের উদ্দেশ্য কিছুটা অনুমান করা যায় ?

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না···বলতে বলতে মিষ্টার সিংহ চিন্তিত ভাবে কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন :

—তবে একটা ব্যাপার অবশ্য ছিল, খুনের সঙ্গে সেটার হয়ত কোন সম্বন্ধ আছে···পুলিস অফিসারের কান খাড়া হয়ে গেল—কি ?

—সম্প্রতি সান্যাল সায়েব কলকাতা গিয়েছিলেন। যেদিন দিল্লী ফিরলেন

আমি তাঁকে ষ্টেশনে আনতে গিয়েছিলাম। রাস্তাতে সান্যাল সায়েব আমায় জানিয়েছিলেন যে এবার তাঁর সঙ্গে সত্তর হাজার টাকা এনেছেন। একশ টাকার নোটগুলো ভাঙ্গিয়ে দশ টাকার নোট আনতে বলেছিলেন আমায়।

—সান্যাল সায়েব যখন আপনাকে টাকার কথা বলেছিলেন তখন আপনি ছাড়া আর কেউ সঙ্গে ছিল? পুলিস অফিসার সিংহের কথার মাঝখানেই জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ আমি ছাড়া গাড়ীতে তাঁর চাকর হরিহর লঙ্কা ছিল, মিষ্টার সিংহ জানালেন।

—তারপর?

—আমি তুবারে একশ টাকার নোটগুলো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে দশ টাকার নোট এনে তাঁকে দিয়েছিলাম। সে সব টাকা মনে হয় তিনি আয়রন সেফে রেখেছিলেন। নোট গোনবার সময় হরিহর লঙ্কা আমায় সাহায্য করেছিল।

এই খবরটা পুলিসের অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বটে কিন্তু আয়রন সেফের তালা খোলা বা ভাঙ্গা হয়নি, টাকাও মজুদ। আয়রন সেফে সত্তর হাজার টাকা ঠিকই রয়েছে।

পুলিস চাকরদের জেরা করতে আরম্ভ করল। সান্যাল সায়েবের চাকর দিলীপ জানাল যে সে-রাত্রে টর্চের আলোয় চারজন লোককে সে ঘরের মধ্যে দেখেছিল কিন্তু কাউকেই চেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ লোকগুলোর মুখ ঢাকা ছিল। তার চীৎকারে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গেল লোকগুলো।

সান্যাল সায়েবের অন্য চাকর হরিহর লঙ্কাকে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন:
—তুমি লোকগুলোকে পালাতে দেখেছিলে?

—না, কাল আমি সেকেণ্ড শোতে সিনেমা গিয়েছিলাম। রাত্রে যখন ফিরলাম তখন সবাই সায়েবকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল।

—সিনেমা যাবার কথা এখানে আর কারও কাছে বলেছিলে?

—না, কাল হঠাৎ সিনেমা দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল তাই গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন শুনে হরিহরের ঘাবড়ে যাওয়াটা অফিসারের দৃষ্টি এড়ায় নি, যদিও হরিহর নির্বিকার ভাব দেখাতে চেষ্টা করছিল।

ইতিমধ্যে তার পায়ের দিকে নজর পড়ল পুলিস অফিসারের, একটু খটকা লাগল···জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি খালি পায়ে কেন?

—আমার একটা চটি হারিয়ে গেছে—হরিহরের ভীত স্বর অফিসার লক্ষ্য করলেন।

হরিহরের পায়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে তাঁর হঠাৎ এমন একটা জিনিস চোখে পড়ল যে তিনি একটু হেসেই ফেললেন। হরিহর লঙ্কা যে প্যাণ্ট পরেছিল তার পায়ের মোড়া অংশ থেকে কাঁচের কিছু টুকরো দেখা যাচ্ছিল। যেন সেই নির্জীব কাঁচের টুকরোগুলো চিৎকার করে অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে চাইছে।

হরিহর লঙ্কাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হল। তার প্যাণ্টের ভাঁজ থেকে পাওয়া কাঁচের টুকরো ও ঘরের মধ্যে গ্লাস ভাঙ্গা টুকরোগুলোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখা গেল দুই জায়গার কাঁচই এক।

হরিহর লঙ্কা অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হল। স্বীকারোক্তিতে সে বলল এই হত্যাপরাধে সে ছাড়া আরও চারজন ছিল, তাদের মধ্যে কেবল একজনের নাম ঠিকানা সে জানে।

—সে কে?

—শ্রীচন্দ, মীরাট জেলার খেকড়া গ্রামে সে থাকে।

—তাকে তুমি কতদিন থেকে জান?

—সে আগে এখানেই চাকরদের কোয়ার্টারে থাকত কিন্তু তার চালচলন ভাল ছিলনা বলে সায়েব তাকে বার করে দিয়েছিলেন।

—মালিককে খুন করবার ইচ্ছা তোমার মনে কেমন করে এল? তার উদ্দেশ্যটা জানবার জন্য পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি সেই সত্তর হাজার টাকা চুরি করে পালাবার মতলব এঁটেছিলাম।

এই জন্য আমি শ্রীচন্দের সঙ্গে পরামর্শ করি। সে-ই আমায় আরও তিনজন লোককে সঙ্গে নেবার পরামর্শ দিয়েছিল···আরও চারজন আমার সঙ্গে ছিল···কিন্তু···

—তোমরা ঘরে ঢুকলে কি করে ?

—আমি আগে থেকে ঘরের দরজা খুলে রেখে দিয়েছিলাম। অন্য চাকরেরা যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি ও তারা চারজন ঘরে ঢুকেছিলাম। আমি জানতাম চাবির গোছা সায়েব বালিসের তলায় রাখতেন। আমিই সাবধানে চাবি বার করে শ্রীচন্দকে দিয়েছিলাম। শ্রীচন্দ আলমারী খুলতে পারেনি। তখন অন্যেরা চেষ্টা করল খুলতে, কিন্তু তারাও কেউ পারল না···। এই সময় শ্রীচন্দের হাত লেগে ছোট টেবিলের ওপর রাখা কাঁচের গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে গেল। শব্দ হওয়াতে সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল, লোক দেখে চীৎকার করে উঠলেন। ধরা পড়ার ভয়ে দুজন লোক তাঁর গলা টিপে ধরল আর একখানা ধুতি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল। সেই সময় বারান্দায় টর্চের আলো দেখে আমবা পালিযে গেলাম।

হরিহর লঙ্কা সমস্ত ঘটনাটার পূর্ণ বিবরণ দিল।

এবার বাকী অপরাধীদের ধরাই পুলিসের প্রধান কর্তব্য। শ্রীচন্দ ছাড়া আর কারও নামই পুলিসের জানা ছিলনা। শ্রীচন্দকে ধরবার জন্য পুলিস দুদিন ধরে খেকড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল কিন্তু তাকে ধরা গেলনা।

শ্রীচন্দেরই পরিচিত একজন লোক খবরের কাগজে পড়েছিল যে পুলিস শ্রীচন্দকে সান্যাল হত্যার মামলার ব্যাপারে খোঁজ করছে। সেই লোকটিই খুব কায়দা করে শ্রীচন্দকে দিল্লী নিয়ে এল এবং শ্রীচন্দ গ্রেপ্তার হল হত্যার তৃতীয় দিনে।

শ্রীচন্দকে জেরা করে পুলিস অমিলাল, জুম্মা ও মঞ্জুর আহমেদ এই তিন জনকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হল।

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত থলিটা জুম্মার ছিল, ছোট তোয়ালেটা শ্রীচন্দের, চটিটা ছিল অমিলালের, গেটের বাইরে পাওয়া জুতো জোড়া মঞ্জুর

আহমেদের। সবগুলি জিনিসই অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণরূপে আদালতে গ্রাহ্য হল।

হত্যার অভিযোগে পুলিস এদের সকলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। অমিলাল রাজসাক্ষী হল। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণগুলির সাহায্যে অপরাধীদের অপরাধ সাব্যস্ত হল। আদালতের বিচারে মঞ্জুর আহমেদ ও শ্রীচন্দের ফাঁসির সাজা হল, হরিহর লস্কা ও জুম্মার আজীবন কারাদণ্ড হল।

দক্ষ পুলিসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চেষ্টায় মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমস্ত অপরাধী গ্রেপ্তার হল এবং যথাযথ প্রমাণের সাহায্যে আদালতে অপরাধীদের সমুচিত সাজা হল।

চলন্ত ট্রেনে হত্যা

পনের আপ বেনারস এক্সপ্রেস যখন বড়হিয়া ষ্টেসন থেকে ছাড়ল তখন রাত ঠিক বারোটা। নির্জন রাত্রে ট্রেন ছোট ছোট ষ্টেসনগুলোয় না থেমে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাল জংশনে ব্রেক কষে ট্রেন থেমে যাওয়ার বিকট শব্দে যাত্রীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই জানতে চায়, গাড়ী থামল কেন?

গাড়ী থামতেই টি-টি-আই শ্রীওঝা চটপট নেমে এর কারণ অনুসন্ধান করতে দ্রুত পায়ে গার্ডের কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল প্রথম শ্রেণীর একটা কামরার খোলা দরজার দিকে। দরজার ভেতরে উঁকি দিয়েই ওঝা শিউরে উঠলেন। কামরার মেঝের উপর এক মুমূর্ষু যাত্রী পড়ে আছেন, চারপাশে রক্ত মাখামাখি।

কয়েক মুহূর্ত ওঝা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। গার্ড বললেন—রেলওয়ে পুলিসকে অবিলম্বে খবর দেওয়া দরকার। ওঝা একটা কাগজে লিখলেন—'পনের আপ বেনারস এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরায় আহত এক ব্যক্তি মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন। অবিলম্বে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হোক।'

মোকামার রেলওয়ে পুলিস ইন্সপেক্টর রাত্রি একটার সময় এই খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

পুলিস ইন্সপেক্টরের বারংবার প্রশ্নের উত্তরে আহত যাত্রীটি অতি কষ্টে কেবল এই কটি কথা বললেন যে কামরায় তিনি একা ছিলেন আর তাঁর বালিসের নিচে টাকার ব্যাগ ছিল। এইটুকু বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। যাত্রীর অবস্থা সঙ্কটজনক দেখে তাঁকে অবিলম্বে পাটনা মেডিকেল কলেজে পাঠাবার ব্যবস্থা হল, কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হল।

যাত্রীর দুহাতে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন দেখে বোঝা গেল তিনি শেষ পর্যন্ত আততায়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর বিছানা এবং কামরার মেঝে

রক্তারক্তি তাছাড়া ডেঞ্জার সিগ্‌ন্যালের চেন আর দরজার হাতলের ওপরও রক্তের দাগ দেখা গেল। কামরাটি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হল। সেখান থেকে রক্তমাখা একটা ছুরি, টাকা পয়সা রাখার কাপড়ের একটা বটুয়া আর একটা থলি পাওয়া গেল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য কামরাটি ট্রেন থেকে কেটে সাইডিংএ রাখা হল।

ইতিমধ্যে প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাত্রী খুন হওয়ার খবর রটে যাওয়ার ফলে সেখানে যাত্রীদের একটা বড়রকম ভিড় জমে গেল। পাশের আর একটি প্রথম শ্রেণীর কামরার এক যাত্রী শ্রী ঠাকুরকে পুলিস ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি কোন লোককে ঐ কামরায় উঠতে বা নামতে দেখেছেন ?

শ্রী ঠাকুর উত্তর দিলেন—ট্রেন যখন বড়হিয়া ষ্টেশনে পৌঁছয় তখন আমি খুব ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমার কামরার দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। আমি জানলা দিয়ে দেখি আমার কামরার সামনে দু তিনজন লোক। দেখেই আমি বুঝতে পারলাম তারা ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী নয়।

উৎসুক পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর ?

—আমি তাদের বললাম ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট না দেখালে আমি কামরার দরজা খুলব না। ইতিমধ্যে সিগন্যাল হয়ে গেল, আমি জানলা দিয়ে দেখলাম লোকগুলো ঐ কামরাতেই উঠল।

পুলিস অফিসার যখন শ্রী ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন তখন আর একজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী শ্রী রামনাথ, শ্রী ঠাকুরের কথায় সায় দিয়ে ঠিক একই কথা বললেন। তিনি আরও বললেন—চেন টানবার পর তাল জংশনে হঠাৎ ট্রেন থামতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানলা দিয়ে দেখলাম ঐ কামরা থেকে দুজন লোক নেমে গেল। তাদের একজনের মাথায় পটি বাঁধা ছিল। সেই দুজনকে ঐ কামরা থেকে একটা বড় স্যুটকেসও নামাতে দেখেছি আমি।

—তাদের চেহারা কেমন বলতে পারেন ? পুলিস ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন।

—রাতের অন্ধকারে ভাল করে লোক দুটোকে দেখতে তো পাইনি, কিন্তু একজনের মাথায় পটি বাঁধা ছিল এটা আমি ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম।

পুলিস ট্রেনের কামরাগুলি অনুসন্ধান করল। রেল কর্মচারীদের সাহায্যে প্রত্যেক কামরা খুঁজে দেখা হল, এমন কোন যাত্রী খুঁজে পাওয়া গেলনা যার মাথায় পটি বাঁধা। অনুসন্ধানের সময় তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় বড় একটা স্যুটকেশ দেখে অন্য যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল দুজন যাত্রী ঐ স্যুটকেশ নিয়ে গাড়ীতে চড়েছিল। স্যুটকেশটা কামরায় রেখে তারা নেমে গেছে।

স্যুটকেশের মালিকের সন্ধান না পেয়ে পুলিস সেটা খুলে দেখল। তারমধ্যে একটা পারিবারিক ফটো-অ্যালবাম ছিল, নাম লেখা ছিল প্রেমচন্দ কাপুর। ঐ অ্যালবামে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে নিহত যাত্রীটির কয়েকটা ফটো ছিল। নিহত যাত্রীকে সনাক্ত করা সম্ভব হল ঐ ফটোগুলির সাহায্যে।

ট্রেনে স্যুটকেশ পাওয়া যেতে পুলিস বুঝতে পারল যে আততায়ীরা মোকামা ষ্টেশনেই আছে। আবার ভাল করে অনুসন্ধান করা হল কিন্তু লোকগুলোকে ধরা গেলনা। মোকামা থেকে বাইরে যাবার সমস্ত সড়কে কড়া পাহারা রাখা হল। সাদা পোশাকে স্থানীয় পুলিস সন্দেহজনক লোকেদের খোঁজ-খবর নিতে লাগল। দুদিন ধরে কাছাকাছি সমস্ত দাগী অপরাধীদের খোঁজ নেওয়া হল। মোকামা থেকে বহির্গামী সমস্ত ট্রেন যাত্রীদের ওপর পুলিসের নজর সুতরাং এই ব্যুহ ভেদ করে আততায়ীদের পক্ষে মোকামা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ হলনা।

বাস্তবিক এ পর্যন্ত যতটা খবর পুলিস যোগাড় করেছিল তা বড় কম নয়। পুলিস ইন্সপেক্টর শ্রী সিংহ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন অপরাধীদের ধরবার জন্য, দিনরাত তাঁর চোখের সামনে মাথায় পটিবাঁধা সেই অজ্ঞাত আততায়ীর চেহারাটা যেন ঘুরতে লাগল।

ঘটনার তৃতীয় দিনে মোকামা ষ্টেশনের বাইরে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের

বিশ্রামালয়ে খুব ভীড়। রাত্রে যাত্রীরা ঘুমোবার জন্য এদিক ওদিক যেখানে পাচ্ছে নিজেদের শতরঞ্জি, কম্বল বিছিয়ে নিচ্ছে। ষ্টেশনে ঘুরতে ঘুরতে যখন শ্রী সিংহ তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে দুজন যাত্রী আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

কাছে গিয়ে তিনি ডাকলেন, তাদের ঘুম ভাঙ্গলনা, দুজনেই আগের মত মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল। পুলিস অফিসার ওদের একজনের চাদরে টান দিতেই একটা পটিবাঁধা মাথা দেখা গেল।

কড়া গলায় শ্রীসিংহ জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? সন্দেহজনক লোকটা ধীরে বলল—আমার নাম শিবকান্ত।

—কোথায় যাবে?

—বক্তিয়ারপুর।

—টিকিট কই?

লোকটি বড়হিয়া থেকে বক্তিযারপুরের টিকিট পকেট থেকে বার করে দেখাল। টিকিট দেখে পুলিস ইন্সপেক্টরের সন্দেহ আরও বাড়ল। জিজ্ঞাসা করলেন—এ টিকিট তো দুদিন আগেকার, তুমি মোকামায় নেমেছিলে কেন?

—মোকামায় আমার কাজ ছিল তাই নেমেছিলাম।

—অন্য লোকটি কে?

সন্দেহজনক লোকটা একটু দ্বিধা করে বলল—ও আমার সঙ্গী রাজেন্দ্র সিংহ।

তখনই তাদের গ্রেপ্তার করা হল। তাদের দুজনেরই ধুতি আর জুতোয় রক্তের দাগ ছিল। তারাই যে কাপুরের হত্যাকারী সে বিষয়ে পুলিসের আর সন্দেহ ছিলনা। তিনদিন ধরে তাদের জেরা করেও অপরাধ কবুল করান গেলনা। দুজনেই বলল, দুদিন আগে পনের আপ ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে তারা এসেছে। চেন টানার ফলে হঠাৎ গাড়ী যখন তাল জংশনে থামল তখন তারা পাশের ফাষ্ট ক্লাশ কামরা থেকে চিৎকার শুনতে পেয়েছিল। কৌতূহলবশে তারা ঐ কামরায় গিয়েছিল, এবং মেঝের ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা

যাত্রীকেও দেখতে পেয়েছিল। কামরায় যেতে আসতে তাদের ধুতি ও জুতোয় রক্তের দাগ লেগেছিল।

কিন্তু তাদের বানানো গল্পে পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া গেলনা। বক্তিয়ারপুর ও আরও কয়েক জায়গায় তাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল ঐ লোক ছুটো পাকা জুয়াড়ী। তিনদিন আগে জুয়া খেলায় তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

তাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ করে পুলিস মামলা দায়ের করল। রাসায়নিক পরীক্ষায় তাদের কাপড়ের রক্তের দাগ মৃত ব্যক্তির রক্ত বলে প্রমাণিত হল। তারা ফার্ষ্ট ক্লাসের কামরায় উঠেছিল ও নেমেছিল এটা প্রমাণিত হল শ্রী ঠাকুর ও শ্রী রামনাথের বিবৃতি ও সাক্ষীতে। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী না থাকা সত্বেও অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে কোর্টে তাদের ফাঁসির হুকুম হল। তবে আসামীর ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় ফাঁসির দণ্ড মকুব হয়ে পরিবর্তে আজীবন কারাদণ্ড হল।

বিবাহ চক্র

উনত্রিশ ডাউন বোম্বাই-হাওড়া এক্সপ্রেস যখন মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ষ্টেশনে থামল তখন রাত্রি দশটা। এক নম্বর প্লাটফর্মে গাড়ী থামতেই সেকেণ্ড ক্লাস থেকে এক যুবককে খুবই বিপন্নভাবে নামতে দেখা গেল। ট্রেন থেকে নেমে সে এক টি-টি কে জিজ্ঞাসা করল—রেল পুলিসের থানা কোথায় বলতে পারেন?

টি-টি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—ঐযে বোর্ড লাগান রয়েছে।

যুবক দ্রুত পদে সেখানে গিয়ে ঘরে ঢুকেই আর্তস্বরে বলে উঠল—আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি ইন্সপেক্টর সাহেব। তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখলেই বোঝা যায়।

পুলিস অফিসার শ্রীবাস্তব যুবকটিকে বসবার নির্দেশ দিয়ে বললেন—প্রথমে আপনি স্থির হন, এত ঘাবড়ে গেলে চলে?

যুবক দুহাতে নিজের মাথাটা ধরে চুপচাপ চেয়ারে বসে পড়ল। তার চোখের জল তখনও শুকোয় নি।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাম?

—আমার নাম সুশীল কুমার নাইডু, আমি আজমীরের সরকারী হাসপাতালের অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জন।

—এই ট্রেনেই আসছিলেন?

—হ্যাঁ, নাগপুর থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে বসেছিলাম। আমার কাছে একটা স্যুটকেস ছিল, স্যুটকেসে নগদ পাঁচ হাজার টাকা, ঘড়ি, ক্যামেরা, ট্রানজিস্টর রেডিও, সোনার চেন আর কাপড় জামা ছিল। রাস্তায় আমার স্যুটকেস খোয়া গেছে, এখন আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। বলতে বলতে সে আবার কেঁদে ফেলল।

—এত ঘাবড়ে যাবেন না। চুরির ব্যাপারে আমরা আপনাকে যথাসাধ্য

সাহায্য করব। ডাক্তার নাইডুকে সান্ত্বনা দিয়ে পুলিস অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে কেন আসছিলেন ?

—কিছুদিন আগে আমি সরকারী কাজে হোশঙ্গাবাদ গিয়েছিলাম। সেখানে কালেক্টরী অফিসে এক নাইডু কাজ করেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। আলাপ পরিচয়ে যখন তিনি জানলেন আমি অবিবাহিত তখন তাঁর ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। আমি তাঁকে বললাম, মেয়েকে না দেখে আমি বিবাহ করতে পারব না। তখন তিনি বল্লেন, তাঁর ভাইয়ের মেয়ে কুমারী এস. রাম রায়পুরের কলেজে অধ্যাপনা করেন। রায়পুরের ঠিকানা দিয়ে মেয়েটিকে দেখতে যাবার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আসা কিন্তু এখন তো আমি ভিখারী হয়ে গেলাম।

—হুঁ—পুলিস অফিসার চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলেন—আপনার স্যুটকেস কিভাবে চুরি হল ?

—হোশঙ্গাবাদ থেকে আমি জব্বলপুর গিয়েছিলাম। সেখানে দুদিন কর্নেল মুখার্জীর বাড়ীতে ছিলাম। তিনি আমার বাবার পুরানো বন্ধু। জব্বলপুর থেকে আমি নাগপুর প্যাসেঞ্জারের সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ি। ঐখান থেকেই সেই কামরায় দুজন লোক চড়েছিল। ট্রেনেই তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। লোক দুটি বলল যে তারা রাউরকেল্লার এঞ্জিনিয়ার। নাগপুরে গাড়ী বদল করতে আমরা তিন জনই একসঙ্গে গাড়ী থেকে নামলাম, ষ্টেশনেই খাওয়া দাওয়া হল। বেলা প্রায় একটায় বোম্বাই-হাওড়া এক্সপ্রেস পৌঁছলে আমরা সেকেণ্ড ক্লাসের একটা কামরায় উঠলাম। কামরায় আর কোন যাত্রী ছিল না। প্রায় সাড়ে তিনটের সময় গাড়ী ভাণ্ডারা ষ্টেশনে পৌঁছল।

—তারপর কি হল ? পুলিস অফিসার জানতে চাইলেন।

—ইতিমধ্যে ঐ লোক দুটির সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন নিজের ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালতে ঢালতে আমায় জিজ্ঞাসা করল, কফি খাই কিনা। আমি কফির পেয়ালা নিয়ে চুমুক দিলাম।

—ঐ দুজন লোকও কফি খেয়েছিল ? শ্রীবাস্তব যুবকটির কথার মাঝখানেই জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ, একজন খেয়েছিল।

—তারপর কি হল আমি বলতে পারব না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময় গাড়ী যখন দূর্গ ষ্টেশনে থামল তখন আমার খানিকটা জ্ঞান ফিরল। কামরায় আমি একেবারে একা—আমার স্যুটকেস আর সেই লোক দুটি গায়েব হয়ে গেছে·········

—তাদের নাম ঠিকানা আমাদের জানাতে পারেন ?

—তারা আমায শুধু এইটুকু জানিয়েছিল যে তারা রাউরকেল্লার এঞ্জিনিয়াব। তাদের নাম ঠিকানা ত' আমি জানি না।

—যাই হোক, অপরাধীকে ধরবার কোন ক্রটী আমরা করব না —পুলিস অফিসার নাইডুকে আশা দিয়ে বলেন।

—কি আর বলব ইন্সপেক্টর সায়েব, আমি একেবাবে ডুবে গেলাম। ভ্রমণ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমি নিজের বোকামিতে সর্বস্বান্ত হলাম বুঝতেই পারছি না যে কি করব

—এখন আর দুঃখ করে লাভ কি? শ্রীবাস্তব ডাক্তার নাইডুকে বললেন—চলুন আমি আপনাকে বৈরঙ্গ বাজারে কুমারী এস. রামের বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।

পুলিস অফিসার শ্রীবাস্তবের সঙ্গে ডাক্তার নাইডু কুমারী এস. রামের বাড়ী এলেন। শ্রীবাস্তব কুমারী রামের বাবার সঙ্গে ডাক্তার নাইডুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য আর ট্রেনে সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা জানাতে সে পরিবারের সকলেই ডাক্তার নাইডুর প্রতি সহানুভূতি জানালেন।

পুলিস জব্বলপুর ও নাগপুর ষ্টেশনে অনুসন্ধান আরম্ভ করল। দুই ষ্টেশনেই কর্মচারী ও কুলীদের কাছে ঊনত্রিশ ডাউন এক্সপ্রেসের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হল কিন্তু কোন খবরই পাওয়া গেল না।

নাগপুর ষ্টেশনের বুকিং অফিসে টিকিট বিক্রয়ের হিসাব দেখতে গিয়ে খুবই আশ্চর্য মনে হল তাঁর, কারণ বাইশে এপ্রিল উনত্রিশ ডাউনের সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট একখানাও বিক্রী হয়নি।

পুলিস অফিসার রায়পুর ফিরে এসে ডাক্তার নাইডুর গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য বৈরঙ্গ বাজারে দুজন সাদা পোশাকধারী কনস্টেবল নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয় দিনই তারা খবর দিল ডাক্তার নাইডু কুমারী রাম ও তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে বেড়ানো, সিনেমা দেখা ইত্যাদিতে ব্যস্ত আছেন।

দু তিন দিন পরে ডাক্তার নাইডু শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করতে থানায় এলেন। শ্রীবাস্তব সখেদে বললেন—বড়ই দুঃখের কথা ডাক্তার সায়েব, এখনও চুরির কোন সুরাহা করতে পারলাম না তবে আমি সমস্ত জায়গায় অনুসন্ধান আরম্ভ করেছি, কোন সূত্র পেলেই অপরাধীদের ধরবার চেষ্টা করা হবে।

—আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। যা চুরি গেছে তা আর ফেরৎ পাবার কোন আশা নেই। তবু আপনি আমার জন্য এত পরিশ্রম করছেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

শ্রীবাস্তব বিষয়ান্তরে যাবার উদ্দেশ্যে বললেন—আচ্ছা ডাক্তার সাহেব এবার বলুন যে কাজে এখানে এসেছেন তা কতদূর এগিয়েছে। অর্থাৎ কুমারী রামের সঙ্গে বিবাহের কতদূর কি হল···

—বিয়ের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা আমার পছন্দ নয়। স্ত্রী জাতিকে বোঝা সহজ কাজ নয়। মনে হচ্ছে আরও কিছুদিন আমায় এখানে থাকতে হবে—ডাক্তার নাইডু হেসে বললেন।

খানিকক্ষণ বিবাহের সম্বন্ধে কথাবার্তার পর শ্রীবাস্তব জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এখানে আর কোন লোককে চেনেন নাকি ?

—এখানে তো আর কেউ পরিচিত নেই তবে ভূপালে আমার এক আত্মীয় আছেন। আপনি সম্ভবত তাঁকে জানেন—শ্রীনাইডু, অ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিস······

—আরে এ. আই. জি আপনার আত্মীয় ? আপনি আগে কেন বলেন নি ? পুলিস অফিসার অবাক হয়ে বললেন।

—আমি এটা জানান দরকার মনে করিনি। এখন আপনি জিজ্ঞাসা করলেন তাই বললাম। এখান থেকে ফেরবার পথে ভূপালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাব।

ডাক্তার নাইডুর কথা শুনে শ্রীবাস্তব চিন্তান্বিত হলেন। বাস্তবিক যদি ডাক্তার নাইডু এ. আই: জির আত্মীয় হয় তাহলে এই চুরির সম্বন্ধে তাঁকে জানান কর্তব্য। শ্রীবাস্তব সাহস সঞ্চয় করে ভূপালে এ. আই. জির অফিসে টেলিফোন বুক করলেন। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠল, শ্রীবাস্তব ভয়ে ভয়ে রিসিভার তুললেন—স্যর আমি শ্রীবাস্তব রায়পুরের জি. আর. পি বলছি।

—বলুন কি ব্যাপার ?

—স্যর, আপনার এক আত্মীয় ডাক্তার সুশীল কুমার নাইডু গত বাইশে এপ্রিল উনত্রিশ ডাউনে রায়পুর আসছিলেন। ট্রেনে তাঁর স্যুটকেশ চুরি যায়। তাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছাড়া আরও অনেক কিছু ছিল। আমি খুবই চেষ্টা করছি চোরদের······

—কোন ডাক্তার নাইডু ? এ নামে আমার কোন আত্মীয় নেই। চুরির অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমার ঐ তথাকথিত আত্মীয়ের ওপরও একটু নজর রাখবেন। আমায় আবার টেলিফোনে এ সম্বন্ধে খবরটা দেবেন······

—আচ্ছা স্যার। ···শ্রীবাস্তব রিসিভার রেখে দিলেন। চুরির হদিশ পাওয়ার পরিবর্তে ডাক্তার নাইডুর রহস্য তখন বেশ ঘনীভূত হয়েছে।

আজমীরের সরকারী হাসপাতালে টেলিফোন করে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে ডাক্তার নাইডুর সমস্ত কথাই বানানো। টেলিফোনে আজমীরের সিভিল সার্জন জানালেন ডাক্তার সুশীল কুমার নাইডু নামের কোন অ্যাসিষ্টেন্ট সার্জন সেখানকার হাসপাতালে নেই।

ডাক্তার নাইডুর সম্বন্ধে এইসব তথ্য জানতে পেরে তার আচরণের রহস্যটা

বোঝবার চেষ্টা করেন শ্রীবাস্তব। এইসব মিথ্যা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্য কি? শ্রীবাস্তব এইসব কথা ভাবছিলেন এমন সময় ডাক্তার নাইডু এসে হাজির।

খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীবাস্তব বললেন—বলুন ডাক্তার কি খবর?

—ঠিকই আছে।···ডাক্তার নাইডু উত্তর দিলেন।

পুলিস অফিসার একটু হেসে বললেন—ডাক্তার মিস রামের সঙ্গে রোমান্স কেমন চলছে?

নিজের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ডাক্তার নাইডু হেসে উত্তর দেন—এখন তো সবে আরম্ভ ইন্সপেক্টর সায়েব···

—তা ঠিক, তবে আপনি তো এই ব্যাপারে ওস্তাদ মনে হচ্ছে—পুলিস অফিসার হেসে বললেন—এর পূর্বে আর কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব সাব হয়নি?

—এখন আর আপনার কাছে গোপন কি করব ইন্সপেক্টর সায়েব·· তিন চারটির সঙ্গে ভাব হয়েছিল। কিন্তু কপাল···তাই তো এখনও আইবুড়ো হয়ে আছি।

—আচ্ছা! বিষয় বদলাবার উদ্দেশ্যে পুলিস অফিসার বললেন—ডাক্তার সায়েব দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার সম্বন্ধে বিশেষ কয়েকটি তথ্য জানা গেছে।

ডাক্তার নাইডু চোখে সরষের ফুল দেখলেন—কি জানা গেছে?

—জানা গেছে যে আপনি ডাক্তার নন, আপনি এ. আই. জি মিষ্টার নাইডুর আত্মীয় নন আর একথাও জানা গেছে যে আপনি যে চুরির রিপোর্ট লিখিয়েছেন তাও মিথ্যা। জানা গেছে যে এর পূর্বে আপনি আরও অনেক মেয়ের জীবন নিয়ে খেলা করেছেন—পুলিস অফিসার নাইডুর সব কীর্তিই তার সামনে তুলে ধরলেন।

—আমায় ক্ষমা করুন ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি বুঝতেই পারিনি যে এত শীঘ্র আপনি সব কথা জানতে পারবেন—ভীত কম্পিত স্বরে নাইডু বলল।

—আগে বলুন চুরির মিথ্যা রিপোর্ট কেন লেখালেন ? পুলিস অফিসারের স্বর বেশ কড়া।

—আগে আমায় ক্ষমা করুন তারপর আমি সব কথা আপনাকে বলছি। নাইডু একটু চুপ করে রইলেন। আমি জীবনে নিরাশ হয়েছি। কয়েক বছর ধরে আমি কোনো সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ বলে আমায় বার বার নিরাশ হতে হযেছে। এবার যাতে কুমারী রামের সঙ্গে বিবাহটা নিশ্চিত হযে যায তাই আমি মিথ্যা গল্প বানিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল এইসব শুনলে কুমারী রামের পরিবারের লোকেদের আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা হবে এবং আমার বিয়েটাও হয়ে যাবে…

—দুঃখের কথা আপনার এই মিথ্যা গল্প ট্রাজেডী হযে গেল—পুলিস অফিসার সমবেদনার সঙ্গে বললেন।

পুলিস অফিসারের সতর্কতার ফলে কুমারী রামের সঙ্গে নাইডুর বিয়ের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেল। তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হল। প্রবঞ্চনা এবং চুরির মিথ্যা রিপোর্ট লেখানর অভিযোগে নাইডুর বিরুদ্ধে মামলা হল, কোর্ট থেকে তার চার মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হল। হাইকোর্টে তার আপীলও খারিজ হয়ে গেল।

হত্যাকারী কে?

এলাহাবাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত চোদ্দই অগাষ্টের খবরে সহর তোলপাড় হয়ে গেল :

"এলাহাবাদের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত নাগরিক শ্রী দ্বারিকা প্রসাদ ট্যাণ্ডনকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। আজ প্রত্যুষে শ্রী ট্যাণ্ডনের রামবাগস্থিত বাসভবনে তাঁর শয্যায় রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অনুমান, রাত্রে গভীর নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। শ্রী ট্যাণ্ডনের ঘরের লোহার সিন্দুক থেকে গহনাও চুরি হয়েছে। সংবাদ পাবামাত্র পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কিন্তু আততায়ীদের কোন হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি।"

শ্রী ট্যাণ্ডন এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। অকস্মাৎ এভাবে তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদে শহরের সকলেই স্তম্ভিত হল। সকলের মুখেই এক কথা এমন কি পথচারীরাও এই হত্যার কথাই আলোচনা করছিল।

কীটগঞ্জ থানায় খুনের সংবাদ পৌঁছবামাত্র পুলিস ইন্সপেক্টর শ্রী সিংহ কয়েকজন কনষ্টেবলসহ রামবাগে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাড়ীর চারদিকের ভিড় সরাবার হুকুম দিয়ে শ্রী সিংহ প্রথমে শ্রী ট্যাণ্ডনের বড় ছেলে শ্যাম কিশোরকে একান্তে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—একটু শান্ত হয়ে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ আমায় বলুন, যাতে আমরা অবিলম্বে অনুসন্ধান শুরু করতে পারি।

পিতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে শ্যাম কিশোরের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছিল। সংযত হয়ে রুদ্ধকণ্ঠে শ্যাম কিশোর বলল—আপনাকে আমি হত্যাকারীদের বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না, এই হত্যা এত রহস্যপূর্ণ যে আমরা নিজেরাই কিছু বুঝতে পারছিনা।

—তবুও···আপনি কখন জানতে পারলেন?

—রাত্রে বাড়ীর সবাই এই বারান্দায় ঘুমিয়েছিলাম। একটু দেরীতে ওঠার অভ্যাস। ভোরে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছোটের চীৎকার শুনতে পেলাম।

—ছোটে কে ?

—ছোটে আমাদের চাকর। সে বাবার ঘরে ঢুকে ঐ দৃশ্য দেখে চীৎকার করে উঠেছিল। তার চীৎকার শুনে আমি দৌড়ে গেলাম। রক্তাক্ত বিছানায় বাবাকে দেখলাম।

—বারান্দায় আর কে কে ঘুমিয়েছিল ?

—ছেলেদের সঙ্গে আমি ঘুমিয়েছিলাম, সামনের দিকে আমার মা ঘুমিয়েছিলেন আর ঐ দিকটায় তিন জন চাকর ঘুমিয়েছিল।

—এত লোকের মধ্যে কেউ কি রাত্রে কোন শব্দ শুনতে পায়নি ? শ্রী সিংহের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—এইটাই তো আশ্চর্যের কথা ইন্সপেক্টর সাহেব। এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে গেল আর আমাদের একজনের ঘুমও ভাঙ্গলনা। শ্যাম কিশোর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল।

সিংহ একটু কি ভেবে নিলেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—রাত্রে চৌকিদার ছিল না ?

—দুজন পাহারাদার রাতে পাহারা দেয়, একজন বাড়ীর সামনে, একজন পেছনে, কিন্তু তারা দুজনই কিছু জানতে পারেনি।

বারান্দা পার হয়ে সিংহ শ্রী ট্যাণ্ডনের ঘরে ঢুকলেন, দৃশ্য দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না। খাটের ওপর রক্তে ভেসে যাচ্ছে মৃতদেহ। খাটের নিচে মেঝের ওপর প্রায় পাঁচ কিলো ওজনের একটা পাথর পড়ে আছে, ঐ পাথর দিয়ে আততায়ী ট্যাণ্ডনের বাঁদিকের কানপাটিতে মেরেছে। মৃতের গলায় একটা কাপড় বাঁধা, সম্ভবত তা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছে। ঘরের এককোণে আয়রন সেফ। খাট থেকে সেফ পর্যন্ত মেঝের ওপর রক্তমাখা পায়ের দাগ, দেখে

অনুমান করা যায় যে হত্যা করার পর আততায়ী লোহার সিন্দুক খুলেছিল। লোহার সিন্দুকের ওপরে আঙ্গুল আর হাতের ছাপ ছিল।

কামরাটা ভাল করে দেখে পুলিস অফিসার বেশ অবাক হলেন, পরিবারের অন্য লোকেরা যেখানে ঘুমিয়েছিল সেখান থেকে ট্যাণ্ডনের খাটের দূরত্ব পনের গজেরও কম, অথচ কেউ কোন শব্দ পায়নি। পুলিস অবিলম্বে কামরার মেঝে ও সেফের ওপর পায়ের ও হাতের ছাপের ফটো নিল।

হত্যা রহস্যের কোন সূত্র না পেয়ে পুলিস থেকে তদন্তের দায়িত্ব উত্তর প্রদেশের ডিটেকটিভ বিভাগের ওপর দেওয়া হল। আদেশ পাবা মাত্র পুলিসের অধ্যক্ষ শ্রী গোপালের নেতৃত্বে সি-আই-ডির লোকেরা এলাহাবাদ রওনা হলেন।

অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ভেবে পুলিসের কুকুরকে মৃত ট্যাণ্ডনের কামরায় ছেড়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র শুঁকে কুকুরটা বাড়ীর পেছনের একটা দেওয়ালের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর সেখানে একটা জানলা দিয়ে বাইরে গিয়ে খুব চীৎকার করতে লাগল। এতে পুলিস এইটকু সঙ্কেত পেল যে অপরাধীরা এই পথেই পালিয়েছিল। এর দ্বারা এও অনুমান করা গেল যে আততায়ীরা শ্রী ট্যাণ্ডনের বাড়ীর সব দরজা জানালার খবর রাখে।

প্রারম্ভিক অনুসন্ধানের পর পুলিসের অধ্যক্ষ শ্রী ট্যাণ্ডনের বড় ছেলে শ্যাম কিশোরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আয়রন সেফের চাবির তাড়া কোথায় গেল ?

—আয়রন সেফের চাবি বাবা নিজের পৈতেতে বেঁধে রাখতেন, সম্ভবত পাথর দিয়ে আঘাত করে তাঁকে অজ্ঞান করে তারা চাবি খুলে নেয়।

—তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আততায়ীরা এ কথাও জানত যে চাবি শ্রী ট্যাণ্ডনের পৈতেতে বাঁধা থাকত।

—নিশ্চয় জানত। শ্যাম কিশোর বললেন।

—কেবল তাই নয়, কামরার অন্য লোহার আলমারীতে তারা হাত দেয়নি। তাতে এও বোঝা যায় যে একথাও তাদের জানা ছিল যে ঐ বিশেষ

আলমারীতেই গহনা গাঁটি রাখা হত এবং অন্য আলমারী বেশীর ভাগ খালি থাকত। পুলিস অফিসার বেশ জোর দিয়ে বললেন।

—আপনার অনুমান ঠিক। শ্যাম কিশোর বললেন।

—আমার অনুমান সত্য হলে এ ব্যাপারে এই বাড়ীরই কারও হাত আছে নিশ্চয়—পুলিসের প্রধান নিজের সন্দেহ ব্যক্ত করলেন।

—হতে পারে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে এ সন্দেহ সত্য বলে মানা যায়—চাপা গলায় শ্যাম কিশোর বললেন।

বাড়ীর সমস্ত চাকর বাকর আর কাছাকাছি থাকেন এমন ষোলো জনের একটা তালিকা তৈরী করা হল। বেশ কদিন ধরে এদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ কবা সত্ত্বেও কিছুই সঠিক জানা গেলনা। ডিটেকটিভ দ্বারা অনুসন্ধানের ফলেও কিছু হলনা যাতে পুলিসের সাহায্য হতে পারে।

শ্রী গোপাল বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সম্ভবপর সব কিছু করা সত্ত্বেও কোন হদিশই পাওয়া গেলনা। বাড়ীর লোকই এ কাজ করেছে তা অনুমান করা হল অথচ চাকর ও অপর লোকদের কথাবার্তায় কিছুই ধরা পড়ল না। অনেক ভেবে চিন্তে এবার যেন একটু আলো দেখতে পেলেন পুলিস প্রধান। তিনি শ্যাম কিশোরকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ীতে পনেরো ষোলো জন চাকর কাজ করে, এদের মধ্যে কাউকেই কি কখনও চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়নি?

—হ্যাঁ, কাজ সন্তোষজনক নয় বলে কয়েকজন চাকর ছাড়ান হয়েছে—শ্যাম কিশোর উত্তর দেন।

—গত দু এক বছরের মধ্যে যাদের ছাড়ান হয়েছে তাদের একটা লিষ্ট আমায় দেখাতে পারেন?

—বাবা একটা রেজিষ্টারে চাকরদের নাম ঠিকানা সব লিখে রাখতেন, আমি সেই রেজিষ্টারখানা এনে দিচ্ছি।

রেজিষ্টার দেখে জানা গেল গত কয়েক বছরের মধ্যে আঠারজন চাকরকে

বরখাস্ত করা হয়েছে, এদের মধ্যে একজনকে দুমাস আগে জবাব দেওয়া হয়েছে। পুলিস অফিসার শ্যাম কিশোরকে জিজ্ঞাসা করলেন—দু মাস আগে অজিত সিংকে চাকরী থেকে ছাড়ান হয়েছিল কেন জানেন কি ?

—সহরে একটা দোকানে দেবার জন্য তার হাতে বাবা দেড়শ টাকা পাঠিয়েছিলেন। টাকা নিয়ে সে সাইকেলে রওনা হয় কিন্তু আর ফেরেনি। দোকানেও টাকা দেয়নি, নিজেও ফেরেনি। তারপর থেকে তার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

অজিত সিং-এর কথা শুনে পুলিসের সন্দেহ হল তার ওপর। জিজ্ঞাসা করলেন—অজিত সিং'এর ঠিকানা জানেন ?

—এই রেজিষ্টারেই বাবা সব নোট করে রাখতেন।

রেজিষ্টার দেখে জানা গেল মজফ্‌ফর নগরের খলবাড়া গ্রামে তার বাড়ী। তার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তদন্তের উদ্দেশ্যে সেইদিনই পুলিসের লোক খলবাড়ায় রওনা হয়ে গেল।

খলবাড়ায় যেতে গ্রামের লোকেরা জানাল যে অজিত সিং সাহারানপুরের মেলায় গেছে। খবর পেয়েই অজিত সিংএর ছোট ভাই জগত সিংকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস ইন্সপেক্টর সাহারানপুর রওনা হলেন।

সাহারানপুর মেলায় অজিত সিং খেলনা আর ফাউণ্টেন পেনের একটা দোকান খুলেছিল। একথা জানতে পেরেই তাকে তার দোকানেই গ্রেপ্তার করা হল। খানাতল্লাশী করে তার কাছে শ্রী ট্যাণ্ডনের ঘড়ি আর কিছু গহনা পাওয়া গেল।

নিজের স্বীকারোক্তিতে অজিত সিং বলল, সে তিন মাস শ্রী ট্যাণ্ডনের বাড়ীতে চাকরী করেছিল, ঐ সময়ের মধ্যে বাড়ীর সমস্ত খবর সে জোগাড় করে। আয়রন সেফ থেকে গহনা ইত্যাদি চুরির উদ্দেশ্যেই সে শ্রী ট্যাণ্ডনকে গলাটিপে হত্যা করে। সে স্বীকার করে যে হত্যা করার পর সে সোজা দিল্লী চলে যায়। মেলায় দোকান দেবার জন্য কিছু খেলনা ফাউণ্টেনপেন ইত্যাদি সে

দিল্লীতেই কেনে। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত পা ও আঙ্গুলের ছাপও অজিত সিংএর হাত পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলে গেল।

সব প্রমাণ একত্র করে পুলিস অজিত সিংএর বিরুদ্ধে শ্রী ট্যাণ্ডনকে হত্যা করার অপরাধে মামলা দায়ের করল। বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণাদির সাহায্যে কোর্ট থেকে তার ফাঁসির সাজা হয়। হাইকোর্টে তার আপীলও অগ্রাহ্য হয়।

ছেলে চুরি

অনেক ভেবেচিন্তে ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে দীননাথ তার স্ত্রী রামিয়াকে প্রসবের জন্য হাসপাতালে পাঠানই স্থির করল। প্রথম প্রসব, কাজেই সবদিক দিয়ে এই ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় ভেবে সে স্ত্রীকে পাটনার সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। রামিয়াকে হাসপাতালে পাঠিয়ে সে নিশ্চিন্ত হল।

পরদিনই হাসপাতাল থেকে ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে তার খুব আনন্দ হল। সে নবজাত পুত্রকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে উঠল, কোন রকমে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। পরদিন ভিজিটিং আওয়ারে দীননাথ হাসপাতালে হাজির হল, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করল। নবজাত প্রথম সন্তানকে দেখে সে যে কি করবে ভেবে পায়না। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে স্ত্রীকে দেখা শোনার জন্য এক বুড়ি দাইকে নিয়ে হাসপাতালে রেখে নিজে বাড়ী ফিরে এল।

রামিয়া সারাদিন বাচ্চাকে নিজের বিছানাতেই শুইয়ে রাখল। শিশুর কান্না হাত পা নাড়া এইসব দেখে সে আনন্দে বিভোর। সন্ধ্যার পর দাই শিশুকে পাশের দোলনায় শুইয়ে দিল। ক্লান্ত দুর্বল রামিয়াও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পরেই তার ঘুম ভাঙ্গতে সে দোলনার দিকে চেয়ে দেখে সেটা খালি। দাইকে জিজ্ঞাসা করল—বাচ্চা কোথায়?

—খানিক আগে এক নার্স এসে দোলনা থেকে নিয়ে গেল। দাই উত্তর দিল।

রামিয়া অবাক হয়ে গেল, দাইকে প্রশ্ন করল—তুমি নার্সকে কিছু জিজ্ঞাসা করনি?

—হ্যাঁ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। নার্স বাচ্চাকে পরিষ্কার করে জামা বদলাতে নিয়ে গেছে। দাই বলল।

এমন সময় হাসপাতালের এক নার্স রামিয়ার বিছানার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—বাচ্চা কোথায়?

—তাকে তো কোন এক নার্স নিয়ে গেছে। রামিয়া বলে

--আর অন্য কোন্ নার্স নিয়ে যাবে? এখন তো আমার নার্স অবাক

অল্পক্ষণের মধ্যেই হাসপাতালের সব ডাক্তার, নার্স প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাচ্চার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে ব্যস্ত হলেন, সারা হাসপাতালে ছুটোছুটি পড়ে গেল। হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে বাচ্চা নিখোঁজ হবার খবরে হাসপাতাল তোলপাড়। রামিয়ার কাতর কান্নায় সবাই বিচলিত হয়ে উঠল। প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজা-খুঁজির পরও যখন বাচ্চা পাওয়া গেলনা তখন রাত্রি এগারোটার সময় পোরবহর পুলিস থানায় গিয়ে বাচ্চা নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট লেখানো হল।

ঘটনার বিবরণ শুনে ইন্সপেক্টর সহায় অবিলম্বে হাসপাতালে ছুটে এলেন। বুঝলেন এ চুরি হাসপাতালের কোন লোকের কাজ। হাসপাতালে পৌঁছে সহায় বাচ্চা সম্বন্ধে অনেককে বহু প্রশ্ন করলেন কিন্তু কোন ফলই হলনা। হাসপাতালের কোন রোগী বা নার্স কাউকে বাচ্চা নিয়ে যেতে দেখেনি। দুদিন ধরে হাসপাতালে অনেক খোঁজ খবর নিয়েও যখন কোন সূত্র পাওয়া গেলনা তখন শ্রী সহায সহরের অন্যান্য প্রধান স্থানগুলিতে তদন্ত করতে মনস্থ করলেন।

শিশু অপহরণকারী দলগুলোর খোঁজ খবর নেবার নির্দেশ দিয়ে কাছাকাছি সমস্ত থানাগুলোয় হাসপাতাল থেকে রামিয়ার শিশুকে অপহরণের খবর দেওয়া হল। সহরের অন্য হাসপাতালেও অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু এমন কোন খবরই পাওয়া গেলনা যাতে শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ঘটনার প্রায় এক মাস পরে একদিন থানা থেকে সাইকেলে করে বাড়ী ফেরার পথে কনষ্টেবল শিবরাম বিড়ি কেনার জন্য চৌরাস্তার পানের দোকানের সামনে থামল। সিপাইকে দেখে পানওয়ালা স্বাগত সম্ভাষণ জানাল—হাবিলদার সায়েব অনেক দিন পরে এলেন।

—হ্যাঁ ভাই, জরুরী কাজে কদিন বাইরে যেতে হয়েছিল। শিবরাম সাইকেল দাঁড় করাতে করাতে উত্তর দিল।

দোকানে দুচারজন এক বিশেষ ভোজের সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। পানওয়ালা শিবরামকে বিড়ির বাণ্ডিল দিতে দিতে বলল—আজ এ পাড়ায় খুব উৎসব।

—কেন কি ব্যাপার ? শিবরাম অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

—কেন, আপনি জানেন না ? ছেলে হয়েছে সেই আনন্দে শেঠ রামজস সারা পাড়ার লোককে নিমন্ত্রণ করেছে। পানওয়ালা হেসে বলল।

—তাই নাকি ? তা ছেলে কবে হয়েছে ?

—তা তো কেউ জানে না। এই আট দশ দিন হল শেঠজীর ছোট বৌ বাপের বাড়ী থেকে ফিরেছে, তার কোলে ছেলে। একটু থেমে আবার পানওয়ালা হেসে বলল—যাই হোক শেঠজীর ছেলের আশা তো পূর্ণ হল !

—শেঠজীর দুই বৌ ? শিবরাম গল্পের গন্ধ পেয়ে খুশী হল।

—হ্যাঁ, প্রথম বৌএর যখন আটবছর ছেলেপুলে হলনা তখন শেঠজী দ্বিতীয় বার বিয়ে করলেন। শুনছি বিয়ের তিন বছর পর ছোট বৌএর ছেলে হয়েছে। পানওয়ালা নিচু গলায় বলল—পাড়ার লোক তো অনেক রকম কথাই বলছে, কিন্তু আসল কথা কেউই জানে না।

—ঠিক বলেছ, আসল খবর কে জানতে পারে ? শিবরাম যাবার জন্যে সাইকেল নিয়ে উঠল। কিন্তু বাড়ী না গিয়ে শিবরাম সোজা থানায় গেল। ইন্সপেক্টর সহায়কে পানওয়ালার কাছে শোনা গল্প বলল।

—আমার তো সায়েব, কিছু গোলমাল আছে বলে মনে হচ্ছে।

—তোমার অনুমান ঠিক হতে পারে, তবে এ সম্বন্ধে ডিটেকটিভ পুলিস দিয়ে প্রকৃত তথ্য জানতে হবে, তার আগে কিছু করা চলবে না। শ্রী সহায় শিবরামকে বোঝালেন।

মচ্ছর হট্টা পাড়ায় পুলিসের জাল পাততে দেরী হলনা। শেঠ রামজসের প্রতিবেশীদের এবং অন্যান্য স্থানীয় দায়িত্বশীল লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পুলিস জানতে পারল যে কয়েক মাস আগে শেঠজীর ছোট বৌ পাড়ার

কয়েকজন মহিলার কাছে বলেছিল বাচ্চা হবার জন্যে সে বাপের বাড়ী যাচ্ছে। গত সপ্তাহে শেঠজী সন্তানের জন্মের সংবাদ প্রচার করে বলে যে স্ত্রীকে আনতে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে। তারপর শেঠজী ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে।

শ্রী সহায় মহা চিন্তায় পড়লেন। তদন্তের পর শেঠজীর ব্যাপারটা সন্দেহ জনক বলে মনে হল অথচ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়ে শেষে যদি এ সন্দেহ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তখন কি হবে? শেষে ইন্সপেক্টর আসল কথা জানবার উদ্দেশ্যে শেঠ রামজস আর তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলবেন ঠিক করলেন।

হঠাৎ বাড়ীতে পুলিস অফিসার শ্রী সহায়কে আসতে দেখে শেঠ রামজস শত চেষ্টাতেও নিজের মনের ভয়টা সম্পূর্ণ গোপন করতে পারলেন না। শ্রী সহায় বললেন—শেঠজী আপনাকে আপনার দুই স্ত্রীকে নিয়ে একবার থানায় যেতে হবে।

—কেন? শেঠজী ঘাবড়ে গেলেন।

—কারণ আমরা জানতে পেরেছি যে, যে শিশুকে আপনি নিজের বলে চালাতে চেষ্টা করছেন সে আপনার ছেলে নয়। শ্রী সহায় শেঠজীকে সোজাসুজি একথা জানালেন।

—তার প্রমাণ? শেঠজী তোতলাতে লাগলেন।

—প্রমাণ আপনার স্ত্রীর ডাক্তারী পরীক্ষার দ্বারা হবে।

একথা শুনেই শেঠজীর ছোট বৌ ধমক দিয়ে উঠল।—মাত্র দশ দিন আগে আমার ছেলে হয়েছে এ অবস্থায় আমার এখন কোথাও নড়বার ক্ষমতা নেই। আমি আপনার নামে মামলা করব।

—তার জন্য আমার কোন ভয় নেই, কিন্তু এখন তো আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতেই হবে। সহায়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

শেঠজীর ছোট বৌএর ডাক্তারী পরীক্ষায় আসল কথা চাপা রইল না।

এ অবস্থায় শেঠজীর সত্য কথা খুলে বলা ছাড়া অন্য উপায় আর রইল না। নিজের অপরাধ স্বীকার করে শেঠজী পুলিসকে জানালেন যে পাড়ায় গোয়ালিনীর সাহায্যে অনেক টাকা খরচা করে তিনি বাচ্চাটি জোগাড় করেছেন।

গোয়ালিনী এবং অন্যান্য সন্দেহজনক লোকদের বিবৃতিতে জানা গেল যে এ শিশু আসলে সেই শিশু যাকে মাস খানেক আগে সরকারী হাসপাতাল থেকে চুরি করা হয়েছিল। রামিয়ার সন্তান। হাসপাতাল থেকে শিশুটি চুরি করতে গোয়ালিনী এবং আর একজন নার্সের হাত ছিল।

সত্য কথা জানা গেলেও শিশুর আসল মা বাবা কে তা প্রমাণ করবার জন্য ডাক্তারী পরীক্ষার দরকার। রামিয়া, দীননাথ এবং সেই একমাসের শিশুর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল তাদের রক্ত 'বি' গ্রূপের। এরপর আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না যে শিশুটি রামিয়া ও দীননাথের।

প্রমাণ পাবামাত্র পুলিস শেঠজী, তার দুই স্ত্রী এবং অন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করল। আদালতে প্রমাণিত হল যে শিশুটি রামিয়া ও দীননাথের সন্তান।

হারানো সন্তান ফিরে পেয়ে রামিয়া আর দীননাথের আনন্দ অনুমান করা যেতে পারে। তাদের আনন্দাশ্রু ও আশীর্বাদই পুলিস অফিসার সহায় নিজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করলেন।

বেনামী চিঠি

শ্রীনগর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটি ছোট গ্রাম, নাম কুলগাঁও। উচু পর্বতমালার উপত্যকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই শান্ত গ্রামটি দেখলে মনে হয় প্রকৃতি পরম আনন্দে এই স্থানটি সাজিয়েছেন। এই পার্বত্য গ্রামের সাদাসিধে অধিবাসীরা স্বভাবতই শান্ত ও সরল প্রকৃতির।

হঠাৎ একদিন গ্রামের পাটোয়ারী শ্রীকান্ত (হিসাব নিকাশ দেখাশোনা করে) নিখোঁজ হওয়ায় গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গেল। শ্রীকান্তর অল্পবয়সী স্ত্রী অরুন্ধতী স্বামীর বিরহে দিনরাত কান্নাকাটি করতে লাগল। তার ভাই প্রেমনাথ আসেপাশের সমস্ত গ্রাম খুঁজে হয়রান হল কিন্তু শ্রীকান্তের কোন খবরই পাওয়া গেলনা। তারপর যখন আটদিন হয়ে গেল তাকে পাওয়া গেলনা, তখন প্রেমনাথ পুলিসে খবর দিতে থানায় গেল।

রিপোর্ট লিখতে লিখতে পুলিস অফিসার কৌল প্রেমনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীকান্ত কবে থেকে নিখোঁজ ?

প্রেমনাথ উত্তর দিল—দশ তারিখে সে রেডওয়ানী গিয়েছিল তারপর থেকে তার আর কোন খবর নেই।

কৌল জিজ্ঞাসা করলেন—এতদিন পর্যন্ত থানায় রিপোর্ট দেননি কেন ?

—আমরা রেডওয়ানী আর তার কাছাকাছি গ্রামগুলোয় তার খোঁজখবর করছিলাম তাই দেরি হল থানায় ডায়রি করতে।

—শ্রীকান্তের সঙ্গে কে কে থাকে ?

—আমার বোন অরুন্ধতী ছাড়া আর কেউ থাকে না তাদের সঙ্গে। প্রেমনাথ উত্তর দিল।

—হুঁ, কৌল চিন্তিত স্বরে বললেন—চলুন আমি আপনার সঙ্গে এখনি সেখানে যাচ্ছি।

পাহাড়ের অন্য দিকটায় গ্রামের বসতি। দুজন কনষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে উঁচু নিচু হাঁটা পথ ধরে শ্রী কৌল পাটোয়ারী শ্রীকান্তের বাড়ী পৌঁছলেন। গ্রামের মোড়ল এবং আরও কয়েকজন লোক আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিল। শ্রী কৌল মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলেন—গত আটদিন ধরে গ্রামের কেউ কি পাটোয়ারীকে দেখেনি?

মোড়ল বলল—না, পাটোয়ারী নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা যেন মনে হচ্ছে তাকে কেউ যাদু করে অদৃশ্য করেছে। যেদিন থেকে সে নিখোঁজ হয়েছে সেদিন থেকে কেউ তাকে না দেখেছে না তার সম্বন্ধে কোন খবর পেয়েছে। বেচারী অরুন্ধতী কেঁদে মরছে। আমরা কাছাকাছি সমস্ত গ্রামে শ্রীকান্তকে খুঁজেছি কিন্তু কোন খবরই পাইনি।

একটু ভেবে কৌল গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, গ্রামের কোন লোকের সঙ্গে পাটোয়ারীর শত্রুতা ছিল।

—না দারোগাবাবু, পাটোয়ারী বড় ভালমানুষ। কারও সঙ্গে তার ঝগড়া নেই। কাজ নিয়ে কাজ তার·········

গ্রামের এক বৃদ্ধ শ্রীকান্তের সম্বন্ধে বলল—তবে ছেলেপুলে নেই বলে পাটোয়ারীর মনে একটা দুঃখ ছিল। কখনও সখনও এমন কথা বলতে শুনেছি তাকে যে সে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

—কোনও সন্তান হয়নি তার?

—না। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তানের আশাতেই সে দ্বিতীয় বিবাহ করেছিল অরুন্ধতীকে। তাও দু বছর হয়ে গেল···কোন বাচ্চাই হল না।

কৌল গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন ইতিমধ্যে প্রেমনাথ ভেতরে গিয়ে ভগ্নী অরুন্ধতীকে নিয়ে এলেন। শোকার্ত অরুন্ধতী এক কোনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ থেকে জল পড়ছে। শ্রী কৌল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এমন করে কেঁদে কি ফল? শ্রীকান্তকে খুঁজে বার করবার সবরকম চেষ্টাই আমরা করব। আচ্ছা, তার সঙ্গে আপনার কোন ঝগড়া হয়েছিল কি?

অরুন্ধতী কাঁদতে কাঁদতে বলল—না, তাঁর সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া হয়নি, তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন।

—আচ্ছা, যাবার সময় তাঁর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল ?

—ন' তারিখে রাত্রে আমায় বলেছিলেন কি একটা দরকারী কাজে রেডওয়ানী যাবেন। পরদিন ভোরে আমি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে চা জলখাবার তৈরী করে দিয়েছিলাম। সকাল আটটায় যাবার সময় বলে গেলেন যে সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ী ফিরে আসবেন। তিনি যখন চলে গেলেন আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাড়ীর সামনের পাহাড়ী পথে যখন তিনি ডানদিকে বেঁকে চোখের আড়াল হলেন তখন আমি দোর বন্ধ করে ভেতরে গেলাম। আমি কি তখন একটুও বুঝতে পেরেছি যে তিনি আমায় মিথ্যা স্তোক দিযে চলে যাবেন ? অরুন্ধতী খুব কাঁদতে লাগল।

কুলগাঁও থেকে রেডওয়ানী প্রায় পাঁচ মাইল পথ। রাস্তার দুধারে পুলিসের লোক অনুসন্ধান করল কিন্তু কোন কিছুই পাওয়া গেলনা। রেডওয়ানীর নম্বরদার জানাল যে দশ তারিখ থেকে শ্রীকান্ত সেদিন পর্যন্ত সেখানে মোটেই আসেনি। রেডওয়ানীর লোকেরাও ঠিক এই কথাই বলল। তবে কি শ্রীকান্ত সন্ন্যাসী হয়ে এইভাবে হঠাৎ গৃহত্যাগ করল ? এইরকম সন্দেহ করে পুলিসকে কাছাকাছি সমস্ত মন্দির মঠ গুলোতেও শ্রীকান্তের অনুসন্ধান করতে পাঠান হল।

মাস খানেক কেটে গেল অথচ পাটোয়ারী শ্রীকান্তের কোন খোঁজই পাওয়া গেলনা। কুলগ্রামের থানায় বসে শ্রী কৌল এই কথাই ভাবছিলেন এমন সময় বাইরে জিপের শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই পুলিসের বড় অফিসারকে ভেতরে আসতে দেখে কৌল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন।

অফিসার চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন—পাটোয়ারী শ্রীকান্তের কেসটার কিছু হল ?

—না স্যার, এখনও পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি। যবে থেকে রিপোর্ট পেয়েছি

কাছেপিঠে যত গ্রাম আছে সব জায়গায় খোঁজা হয়েছে অথচ কোন হদিশই পাওয়া গেলনা। কৌল উত্তর দিলেন।

—দেখুন এবার হয়ত কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে। অফিসার একটু হেসে নিজের পকেট থেকে একটা খাম বার করে বললেন—ডাকে এই বেনামী চিঠি এসেছে। এতে লেখা হয়েছে যে শ্রীকান্ত নিজের কোন এক আত্মীয়ের ছেলে পূরণকে দত্তক নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পূরণই শ্রীকান্তকে তার বাড়ীতেই হত্যা করে ঘরের মেজেয় পুঁতে রেখেছে।

—মাপ করবেন, কিন্তু এ চিঠির কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। আমি নিজে শ্রীকান্তের বাড়ী দু দুবার গিয়েছি। যদি এমন কোন ব্যাপার হত তবে শ্রীকান্তের স্ত্রী অরুন্ধতী নিশ্চয় তা জানাত।

—হতে পারে চিঠিখানা মিথ্যে এবং এটা পাঠাবার উদ্দেশ্য আলাদা··· অফিসার একটু চিন্তিত হয়ে বললেন—তবু বাড়ীটা একবার সার্চ করে দেখাই ভাল।

—ঠিক আছে স্যার, আমি এখনি সে ব্যবস্থা করছি। তারপর একটু ইতস্তত করে কৌল আবার বললেন—বাড়ী সার্চ করার আগে অরুন্ধতীকে মঙ্গলপোরা থেকে ডেকে পাঠাতে হবে···আমি এখনই তাকে আনতে সেখানে কনষ্টেবলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—কেন অরুন্ধতী কি এখানে নেই? পুলিস অফিসার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—সাত আটদিন হল সে নিজের বাপের বাড়ী মঙ্গলপোরায় গেছে। হাঁটাপথে মঙ্গলপোরা এখান থেকে চার মাইল। এক ঘণ্টার মধ্যে কনষ্টেবল তাকে নিয়ে এখানে ফিরতে পারবে।

—না, আমি নিজেই মঙ্গলপোরা যাচ্ছি। অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অরুন্ধতীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাড়ী খোলা হল। শোকে মুহ্যমান অরুন্ধতী এক কোনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল। নিচের তলার একখানা

ঘরের তালা খোলা গেল, কিন্তু পাশের ঘরের তালার চাবি পাওয়া গেলনা।

কৌল অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ঘরের চাবি কোথায় ?

—এ ঘরের চাবি তিনি নিজের কাছেই রাখতেন অরুন্ধতী উত্তর দিল।

—যাক চাবির চিন্তা করতে হবে না। পুলিস অফিসার কৌলকে আদেশ দিলেন—তালা ভেঙ্গে ফেলুন।

হাতুড়ির এক ঘায়ে তালা ভেঙ্গে গেল। দেখা গেল সুসজ্জিত ঘরের মেঝেয় গালিচা বিছান রয়েছে। পুলিস সুপারিণ্টেডেন্ট কৌলকে আদেশ দিলেন—মেজে থেকে গালিচা তুলে ফেলুন।

সুপারের আদেশ শুনেই অরুন্ধতী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে পুলিস ও অন্য লোকেরা অবাক হয়ে গেল। একটু পরেই অরুন্ধতী চোখ মেলে চিৎকার করে বলতে লাগল—আমায় ফাঁসি দাও, আমি আমার স্বামীকে খুন করেছি।

অরুন্ধতী ঘরের মেঝের এক দিকে আঙ্গুলের ইশারা করে বলতে লাগল—এইখানে লাশ পোঁতা আছে।

ঘরের মেঝে খুঁড়ে চাদরে মোড়া শ্রীকান্তের পচা মৃতদেহটা বাইরে বার করা হল।

থানায় অরুন্ধতীর স্বীকারোক্তি লেখবার সময় পুলিস জিজ্ঞাসা করল—শ্রীকান্তকে খুন করেছে কে ? তুমি না পূরণ ?

—আমি খুন করেছি। অরুন্ধতী কাঁদতে থাকে।

—কেন খুন করলে ? সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি তাঁকে ভালবাসতে পারিনি, বয়সে তিনি আমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড় ছিলেন। বিয়ে হয়ে যাবার পর আর কোনরকমে তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পাবার উপায় ছিলনা। আমি কোনরকমে তাঁর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলাম···ইতিমধ্যে···

—থামলেন কেন বলুন ?

—কয়েক মাস থেকে মোহম্মদ ভট আমার জীবনে এল···

—মোহম্মদ ভট কে ? পুলিস স্থপার জানতে চাইলেন।

—শ্রীকান্তের সঙ্গেই একদিন এসেছিল। লেখাপড়ার কাজে সে তাঁকে সাহায্য করত। ধীরে ধীরে আমি তাকে ভালবেসে ফেললাম···

—তারপর ?

—ন' তারিখ রাত্রে মোহম্মদ ভট আমার কাছে এসেছিল। সে সময় শ্রীকান্ত বাড়ী ছিল। তাই আমি তাকে খাটের তলায় লুকিয়ে থাকতে বললাম। শ্রীকান্ত ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি তাকে বার হয়ে আসতে বললাম। তারপর যা হল তা বলা কঠিন—অরুন্ধতী ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে উঠল।

পুলিস স্থপার অরুন্ধতীকে বললেন—এখন আর কান্নায় চিৎকারে কোন ফল হবেনা, তার চেয়ে সত্যি কথা স্বীকার করাই ভাল।

একটু থেমে অরুন্ধতী বলল—আমরা দুজনে শ্রীকান্তকে খুন করব ঠিক করলাম। ঘুমন্ত শ্রীকান্তর মুখ মহম্মদ ভট কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল আর আমি ধারাল ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে দিলাম।

পুলিস অবিলম্বে মোহম্মদ ভটকে গ্রেপ্তার করল। অরুন্ধতীর স্বীকৃতি বয়ানের মত সেও তার বক্তব্যে তাই বলল।

সে আরও বলল—শ্রীকান্তকে খুন করার পর কয়েকদিন পর্যন্ত আমার মন ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। আমি আর থাকতে না পেরে আমার পুরান বন্ধু রহমানকে সব কথা খুলে বললাম। তার কাছে নিজেকে বাঁচাবার কোন উপায় জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমায় এ নিয়ে পাঁচ কান না করতে উপদেশ দিল এবং আমায় বাঁচাবার উপায় বার করবে বলে আশ্বাস দিল। আমায় বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই রহমান বেনামী চিঠি লিখে পুলিসকে জানিয়েছিল যে শ্রীকান্তের হত্যাকারী পূরণ।

স্বামীকে হত্যার অপরাধে শ্রীনগরের আদালতে অরুন্ধতীর বিরুদ্ধে মামলার শুনানী আরম্ভ হল। তার প্রেমিক মোহম্মদ ভট আসামী হয়েও পুলিসের তরফে সাক্ষী দিল। সে বলল—অরুন্ধতী শ্রীকান্তকে হত্যা করেছে। অরুন্ধতীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। কোর্টের রায় শোনবার সময়ও তার চোখে অবিরল অশ্রু ঝরছিল।

জঙ্গলে লাশ

সবুজ গাছপালায় ঘেরা মাদুরাই জেলার নাথম্ গ্রামটি ভারি সুন্দর। গ্রামের লোকেরাও শান্ত, সরল। বেশীর ভাগ লোকই খেতখামার আর নিজেদের অন্যান্য কাজকর্ম নিয়ে থাকে। খুন খারাপি, চুরি এসব অপরাধের কথা এ গ্রামে কখনও শোনা যায়নি।

এমন শান্ত পরিবেশের মধ্যে যে গ্রাম তাতেও একদিন হুলুস্থুল পড়ে গেল। ভোরবেলা গ্রামের কয়েকজন মহিলা মলয়ান্দী মন্দিরে পূজো করতে গিয়ে মন্দিরের কাছে একটা গাছের তলায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে পূজোর ফুল, নৈবেদ্যর থালা মন্দিরেই ফেলে পালিয়ে এল। খবর শুনে ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল সারা গাঁয়ে। অবিলম্বে নাথম্ গ্রামের মোড়ল থানায় দৌড়াল। সেখানে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, —দারোগা বাবু, ভীষণ কাণ্ড হয়েছে।

—কি হয়েছে মোড়ল? পুলিস অফিসার বাসুদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

—লাশ!

—লাশ? কার লাশ? তারপর একটু থেমে বাসুদেব বললেন—এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? শান্ত হয়ে আমায় সব কথা বলুন।

—গ্রামের বাইরে মলয়ান্দী মন্দিরের কাছে এক অচেনা লোকের লাশ পড়ে আছে। একটু আগে মেয়েরা মন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে দূর থেকে লাশ দেখতে পেয়েছে। ভয়ে ভয়ে মোড়ল বলে।

—ঠিক আছে, চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। থানা থেকে কয়েকজন কনষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে বাসুদেব মলয়ান্দী মন্দিরের দিকে রওনা হলেন।

মলয়ান্দী মন্দিরের চারদিকে ঘন জঙ্গল, সে জঙ্গল পেরিয়ে তবে মন্দিরের কাছে পৌঁছালেন বাসুদেব। সেখানে কাপড়ে জড়ান লাশটা পড়ে আছে

দেখলেন। শব একেবারে পচে গিয়েছে, দেখে মনে হল বেশ কদিন ধরে পড়ে আছে। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হলনা। দেখতে দেখতে সেখানে গ্রামবাসীদের ভীড় জমে গেল। পুলিস অফিসার সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ লাশ কার ? কেউ এ লাশ সনাক্ত করতে পারে কিনা তাও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

কিন্তু গ্রামের একজনও চিনতে পারলনা। অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাসুদেব জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন খবরই জানতে পারলেন না।

বাসুদেব চিন্তিত হলেন। লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাতে হবে, অথচ তার আগে সনাক্ত হওয়া দরকার। গ্রামের লোকেদের কাছে কিছুই জানা গেল না। পুলিস অফিসারের সন্দেহ হল এই হত্যার পেছনে এমন কোন রহস্য আছে যা গ্রামের লোকেরা তাঁর সামনে প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছে।

বাসুদেব এইসব ভাবছেন এমন সময় সামনের মাঠে একটা দশ বারো বছরের ছেলেকে ছাগল চরাতে দেখা গেল। তিনি ছেলেটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

—তুমি কি রোজ এখানেই ছাগল চরাও ?

ছেলেটি মাথা হেলিয়ে জানাল—হাঁ। ছেলেটির মনে একটু আত্মপ্রসাদ হল। সে ভাবল একজন পুলিসের পোশাক পরা অফিসার গ্রামের এত লোক ছেড়ে তারই সঙ্গে কথা বলছেন।

এটা সেটা দু চারটে অবান্তর কথার পর বাসুদেব মৃত ব্যক্তির কাপড়টা তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এই কাপড় পরা কোন লোককে এখানে কখনও দেখেছ নাকি ?

ছেঁড়া গেঞ্জিটা ভাল করে দেখে ছেলেটি বেশ জোর দিয়েই বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ তো মুথনের গেঞ্জি।

—মুথন কে ? তাকে চেন নাকি ? পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

—মুথনকে কে না জানে ? ছেলেটি হেসে বলল—সে বড় মজার লোক। সব সময় সকলের সঙ্গে মজা করে।

—তাকে কবে দেখেছ ?

—কদিন হয়ে গেল। তারপর একটু ভেবে ছেলেটি বলল—সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। আমি এই মাঠেই ভেড়া চরাচ্ছিলাম। বৃষ্টি জোরে নামতে আমি সামনের এই গাছটার তলায় গিয়ে বসলাম···।

পুলিস অফিসারের মনে পড়ে গেল আট দশদিন আগে একদিন সকাল থেকেই জোর বৃষ্টি নেমেছিল। বুঝলেন ছেলেটি সত্য কথাই বলছে। জিজ্ঞাসা করলেন :

—তারপর কি হল ?

—সেদিন মুথন এই ছেঁড়া গেঞ্জিটা পরেই ভিজতে ভিজতে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। মুথন আমার পাশেই ঐ গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। আমায় বলেছিল যে সে জঙ্গলে কারও সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

উৎসুক বাসুদেব জিজ্ঞাসা করেন—তারপর কি হল ?

—বৃষ্টি একটু থামলে মুথন মন্দিরের দিকে চলে গেল আমিও এই মাঠেই ভেড়া চরাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি বন্দুকের আওয়াজ পেয়েছিলাম। আশ্চর্য······

—তারপর ?

—প্রায় একঘণ্টা পরে আইয়াকানুকে বন্দুক কাঁধে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম···ছেলেটি একটু ভেবে নিয়ে বলল—আমি সেই দিনই ঘরে ফেরার পর আমার মাকেও বলেছিলাম···।

ছেলেটির কাছ থেকে যা খবর পেলেন তাতে পুলিস অফিসার অবিলম্বে তদন্ত আবশ্যক বলে বুঝলেন।

মুথনের গ্রাম ঘটনাস্থল থেকে দুমাইল দূরে। বাসুদেব অবিলম্বে সেই গ্রামে হাজির হয়ে মুথনের বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—মুথন কোথায় ?

কৃষণ তাচ্ছিল্য সহকারে বলল—সে তো আট দশদিন হল মানাপরাই গেছে।

—সেখানে কি কাজে গেছে ?

—কি আর বলব দারোগাবাবু, বড় ঝগড়াটে হয়ে গেছে মুথন। এবারও আমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে টাকা নিয়ে গেছে। বলছিল, এবার মানাপল্লাই গিয়ে কোন কাজকর্ম করবে। কৃষণ উত্তর দিল।

বাসুদেব তাকে মুথনের মৃতদেহ দেখিযে সনাক্ত করতে বললেন। মৃত মুথনকে দেখে সে হাহাকার করে আছড়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বার বার বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল আমার ভাইকে কে খুন করেছে ?

মুথনের শব সনাক্ত হওয়ার পর অফিসার নিকটবর্তী গ্রামে হত্যাকারী আইয়াকান্নুর খোঁজে গেলেন। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে আইয়াকান্নুকে কদিন ধরে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আইয়াকান্নুর গ্রাম থেকে সরে পড়াটা তার অপরাধের প্রমাণ বলেই অনুমান করলেন বাসুদেব। জোর তদন্ত শুরু হল, কাছাকাছি সমস্ত গ্রামগুলিতে। জানা গেল সে কোথাও লুকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত একদিন পুলিস তাকে এক নির্জন জঙ্গলে পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে গ্রেপ্তার করল।

মুথনকে হত্যার পর আত্মগ্লানিতে আইয়াকান্নু জ্বলে পুড়ে মরছিল। পুলিসের সামনে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলল—আমি মুথনের হত্যাকারী, আমি তাকে গুলি করে মেরেছি, আমায় আপনারা ফাঁসি দিন।

বাসুদেব আইয়াকান্নুকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তাকে খুন করলে কেন, কি এমন হয়েছিল ?

—আমি অনেক দিন ধরে কমলাকে ভালবাসি। তাকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। কমলাও আমায় ভালবাসত, কিন্তু একদিন……

—কি হল একদিন ? উৎসুক বাসুদেব জানতে চাইলেন।

—কমলাকে যখন আমি বিয়ের প্রস্তাব করলাম তখন সে বলল যে সে মুথনকে ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করতে চায় কমলা। তার কথা শুনে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম।

—তারপর ?

—সেদিন ভোরে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে পাখী শিকার করতে গিয়েছিলাম। মন্দিরের কাছে মুথনকে দেখতে পেলাম। সে সময় তাকে খুবই চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। সে আমায় জানাল যে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, সে গ্রাম থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও যেতে চায়। মুথনের এ কথা শুনে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল যে সে কমলাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে চায়। আমি তখনই মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে তাকে চিরকালের মত আমার সুখের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেব।

—তারপর কি হল ?

—আমি পিছন থেকে তাকে গুলি করলাম। গুলি লাগা মাত্র মুথন মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। আমি দ্বিতীয়বার আবার তাকে গুলি করলাম, তারপর তার দেহটা একেবারে স্থির হয়ে গেল। আমি তখন মৃতদেহটা টেনে গাছের তলায় একটা গর্তে ফেলে দিয়ে শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম।

আইয়াকান্নুর ওপর হত্যার অপরাধে পুলিস মামলা দায়ের করল। আদালতে আইয়াকান্নু নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে কিন্তু পরিস্থিতি ও অন্যান্য সাক্ষীপ্রমাণের ফলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল।

ছেঁড়া খাতার পাতা

মধ্য প্রদেশের নরসিংহপুর জেলায় বকোরী নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। ঠাকুর মাদারি সিং এই গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার ওপর যেদিন থেকে তিনি তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সেই গ্রামেরই প্রাচীন জমিদার ঠাকুর নিজাম সিংএর জমিদারী দখল করলেন সেদিন থেকে কাছাকাছি অন্য সমস্ত গ্রামেও তাঁর প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে ঠাকুর সাহেবের কথার ওপর আর কারও কথা চলত না, তাঁর নির্দেশ অমান্য করবার সাহস কারও ছিলনা। মা লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁর সুখ ও ঐশ্বর্যের সীমা ছিলনা।

গরম কাল। ঠাকুর সাহেব সপরিবারে বাড়ীর ভেতরের উঠানে নিদ্রামগ্ন। মাঝরাত্রে সহসা কুকুরের ডাক শুনে তাঁর পত্নী সরস্বতী বাঈএর ঘুম ভেঙ্গে গেল। খাট থেকে উঠে তিনি স্বামীকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য এগিয়ে যাবেন এমনি সময় দুড়ুম দুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হল। বুকে গুলি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী বাঈ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। গুলির শব্দ ও স্ত্রীর আর্তনাদ শুনে ঠাকুর সায়েব ও তাঁর দুই ছেলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে বসলেন। ঠাকুর সায়েবের আর বুঝতে বাকী রইল না যে বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে।

রাত্রের অন্ধকারে ডাকাতেরা গুলি বর্ষণ করতে লাগল। কোন রকমে ঠাকুর সাহেব ও তাঁর দুই ছেলে খাট থেকে নিচে মেঝের ওপর পড়ে ঘস্‌টে ঘস্‌টে পাশের একটা ঘরে পৌঁছালেন। আর এক মুহূর্তও বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তিনি নিজের দুই ছেলেকে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলেন।

বাড়ী থেকে কোন মতে বার হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁরা পাশের অন্য একটা গ্রাম দেবপুরে পৌঁছলেন। গ্রামবাসীদের ডাকাতির খবর দিয়ে সাহায্য চাইলেন তিনি।

এদিকে বাড়ী একেবারে খালি হয়ে যাওয়ায় ডাকাতেরা বিনাবাধায় কাজ সারতে লাগল। প্রথমে তারা লোহার সিন্দুক ও বাক্সের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা, সোনা রূপার গহনা ও অন্যান্য দামী দামী জিনিষপত্র জড় করল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বাড়ীর মধ্যে ডাকাতেরা ইচ্ছামত লুটপাট করতে লাগল। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর সাহেব বাড়ী ফিরে আসার আগেই ডাকাতেরা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি নিয়ে সরে পড়ল।

লোকজন নিয়ে বাড়ী ঢুকতেই ঠাকুর সায়েবের মাথায় বাজ পড়ল। লোহার সিন্দুক, বাক্স ভাঙ্গা, বাড়ীর সবকিছু তছনছ। স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাহাকার করে আছড়ে পড়লেন। গুলি লেগে স্ত্রী মারা গেছেন। মৃত স্ত্রীর কাছে বসে মাথায় হাত দিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কারুর কোন সান্ত্বনাই তাঁকে শান্ত করতে পারলনা।

বড় ছেলে আজমের সিং নিজের কর্তব্য স্থির করতে কাল বিলম্ব করল না। তখনই সাইকেল নিয়ে গ্রাম থেকে তেরো মাইল দূরে গোটে নামে গ্রামের থানার দিকে রওনা হল।

ভোর হবার আগেই আজমের সিং থানায় পৌঁছল। কনষ্টেবলকে ডাকাতির খবর দিয়ে সে দারোগাকে অবিলম্বে জাগিয়ে দিতে অনুরোধ করল। তখুনি দারোগা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এলেন। তাকে দেখে আজমের সিংএর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, কেঁদে ফেলে বলল—আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি দারোগা বাবু, সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।

সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে দারোগা বললেন—কি হয়েছে ?

—ডাকাতে আমাদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে আজমের সিং বলল।

—তুমি কোথা থেকে এসেছ ?

—আমি বকেরীর ঠাকুর মাদারী সিংএর ছেলে।

—আচ্ছা, চিন্তা করনা। এত ঘাবড়ালে কাজ হবেনা। শান্ত হয়ে আমায় সব ঘটনাটা বল।

—কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল, তারা আমার মাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। আজমের সিং কাঁদতে থাকে।

—আমি এখনই তোমার সঙ্গে গ্রামে যাচ্ছি। দারোগা তাকে শান্ত করে বললেন।

কয়েকজন কনষ্টেবল নিয়ে দারোগা যখন মাদারী সিংএর আবাসে পৌঁছলেন সেখানকার দৃশ্য দেখে খুবই বিচলিত হলেন। বাড়ীর সমস্ত জিনিস তছনছ হয়ে গেছে। এ অঞ্চলে এভাবে বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে ডাকাতির ঘটনা বিরল।

ডাকাতদের বিবরণ শুনে দারোগা মাদারী সিংকে জিজ্ঞাসা করলেন—কতজন ছিল ডাকাতদের মধ্যে বা কোনো বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি, যাতে তাদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারবেন?

—না দারোগাবাবু, ডাকাতরা সমানে গুলি চালাচ্ছিল। আমরা অন্ধকারে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ী থেকে বাইরে যাবার চেষ্টা করছিলাম। কোনো ডাকাতকেই কাছ থেকে দেখতে পাইনি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন সুরাহা হল না। দারোগা কিছুই বুঝতে পারলেন না যে এটা কাদের কাজ। কনষ্টেবলদের ডেকে আদেশ দিলেন—বাড়ীর মধ্যে এবং বাইরে খুঁজে দেখ যদি তাড়াতাড়িতে ডাকাতদের ফেলে যাওয়া কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে কিছু খালি কার্তুজ, একটা দা এবং একটা নীল রংএর থলি পাওয়া গেল। বাড়ী অনুসন্ধানের সময় বাইরের দোরের কাছে একটা টুকরোতে দারোগার নজর পড়ল, খাতার ছেঁড়া একটা পাতা! কাগজ তুলে দেখলেন, মনে হল এই কাগজে ডাকাতেরা বারুদ মুড়ে এনেছিল, বন্দুকে ভরবার জন্যে। স্কুলের খাতার পাতা, একদিকে নাম লেখা—রূপলাল ছিপা, পঞ্চম শ্রেণী, উচ্চ বিদ্যালয়, কামোদ।

কামোদের স্কুলে বারো বছরের রূপলালকে সেই ছেঁড়া পাতাটা দেখান হল, দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন—দেখতো, এটা কি তোমার খাতার পাতা?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কোথায় পেলেন ? বিস্মিত রূপলাল জিজ্ঞাসা করে— এটা তো আমার পুরানো ভূগোল নোটের খাতার পাতা।

—পুরানো খাতাগুলো কি তোমার কাছে আছে ? দারোগা জানতে চাইলেন।

—না, আমি সমস্ত পুরানো খাতা প্রহ্লাদকে বেচে দিয়েছি।

—প্রহ্লাদ কে ?

—প্রহ্লাদকে চেনেন না ? সেই প্রহ্লাদ যার বাজি পটকার দোকান ? দারোগার অজ্ঞতা দেখে হাসল রূপলাল।

রূপলালের সঙ্গে দারোগাকে দোকানে আসতে দেখে প্রহ্লাদ ভীত হয়ে উঠল। দারোগা তাকে অভয় দিয়ে বল্লেন :

—তুমি ভয় পাচ্ছো কেন ? ভয় পেলে কাজ হবেনা। শান্ত হয়ে যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও।

—বলুন। ভীত প্রহ্লাদ বলে।

—এই ছেলেটির পুরানো খাতাগুলো কি তুমি কিনেছিলে ?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো কয়েকমাস হয়ে গেল।

—ঠিক আছে। দেখতো মনে করতে পারো কিনা, এটাতে কাকে বারুদ বেচেছিলে ?

—না, দারোগাবাবু, এ কাগজে কাকে বারুদ বেচেছি এতো মনে করতে পারব না। নিরুপায় প্রহ্লাদ উত্তর দেয়।

—আচ্ছা, বারুদ যাদের বিক্রি কর তাদের কোনো রেজিষ্টার রাখ ? চিন্তিত হয়ে দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন।

—হাঁ বাবুজী, রেজিষ্টারে নাম হিসাব দাম সব লেখা আছে। প্রহ্লাদ আলমারী থেকে রেজিষ্টার বার করে দারোগার হাতে দিল।

দারোগা রেজিষ্টারখানা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। গত কয়েক মাস থেকে যারা বারুদ কিনেছে তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে সাত

আটটা নাম নোট করলেন। এদের মধ্যে পুরন সিং নামক একজন মাত্র চারদিন আগে বারুদ কিনেছিল। পুরন সিংএর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে সে গ্রামে নেই। গ্রামের লোকেরা দারোগাকে এ খবরও জানাল যে ডাকাত পড়ার পর কাছেপিঠের গ্রামের জানাশোনা সকলেই মাদারী সিংএর বাড়ী গিয়েছিল সমবেদনা জানাতে কিন্তু সেদিনও পুরন সিং গ্রামে ছিলনা।

পুরন সিংএর সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যেতে পারে এই ভেবে পুলিস তার স্ত্রী ব্রজরানীর কাছে এক মহিলাকে পাঠিয়েছিল। সরল প্রকৃতি ব্রজরাণী কথায় কথায় পূরণ সিংএর গুপ্ত কথা সবই বলে ফেলল। তারপর স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে এ কথাও জানিয়ে দিল যে রাত্রে বাইরে শিস শুনে সেই যে সে কোথায় চলে গেল আজ পর্যন্ত বাড়ী ফেরেনি বা কোন খবর নেই।

এই তথ্যের উপর নির্ভর করে পুলিস পরদিনই পাশের এক গ্রাম থেকে পুরন সিংকে গ্রেপ্তার করল। তল্লাসী করে তার কাছ থেকে লুটের কিছু মাল ও অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেল। ধরা পড়ে গিয়ে বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখে সে পুলিসের কাছে অপরাধ কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাকাত দলের আরও পাঁচজনের নাম বলে দিল। সকলেই লুটের মালসুদ্ধ অবিলম্বে গ্রেপ্তাব হল। খাতার একখানা ছেঁড়া পাতার সাহায্যে একটি পুরো ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল।

সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা হল, এদের মধ্যে দুজনের আজীবন কারাদণ্ড হল, সরকারী সাক্ষী হয়ে যাবার জন্য পুরন সিংএর কোন সাজা হয়নি।

খামের ছেঁড়া টুকরো

সাঁজোজোদা গ্রামের মোড়লের বাড়ী। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, তাই আরও যেন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে বাড়ীটা। পাশের জঙ্গল থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে, তাতে নির্জনতা আরও ভয়াবহ হয়েছে। শিবশঙ্কর বাইরের ঘরে শুয়ে আছেন, বিষণ্ণ মলিন চেহারা, চোখে বিষাদের ছায়া, যেন দুঃখের প্রতিমূর্তি।

আজ সকালে তাঁর বৃদ্ধা মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এই একটু আগে শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরে অবসন্ন শোকার্ত হয়ে শুয়ে আছেন। প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব সকলে সমবেদনা জানিয়ে বাড়ী ফিরে গেছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবার ধীরে ধীরে নিদ্রা দেবীর শান্তিময় আঁচলের আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ছেন।

মধ্যরাত্রি।

গুডুম গুডুম।

সহসা বন্দুকের আওয়াজে শিবশঙ্কর ও তাঁর পরিবারবর্গ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে জেগে উঠলেন।

জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে কড়া সুরে আদেশ—দরজা খোল—দরজা খোল।

আর ঠিক সেই সময়েই পাশের নিচু দেওয়াল টপকে দশবারোজন লোক ভেতরে ঢুকে গেল। তাদের মধ্যে একজন দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। খোলা দরজা দিয়ে আরও কিছু লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। লোকগুলোর মাথা আর মুখ পাগড়ী ও গলাবন্ধ দিয়ে ঢাকা। হাতে বল্লম, তলোয়ার, ছোরা, টাঙ্গি। ডাকাত! শিবশঙ্কর ও তার বাড়ীর লোকেরা ব্যাপার দেখে ভয়ে কাঠ। ডাকাতদের সর্দারের ভয়ঙ্কর আওয়াজ শোনা গেল—খবরদার, কোন রকম শব্দ যদি কেউ করেছ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব।

কয়েকজন ডাকাত শিবশঙ্কর ও তাঁর ভাইকে ধরল, তারপর যথেচ্ছ মারতে মারতে বলল—চাবি বার করে দাও।

অন্য কয়েকটা ডাকাত মহিলাদের আক্রমণ করল, এবং গহনা কেড়ে নিল।

প্রাণে বাঁচবার আশায় শিবশঙ্কর ডাকাতদের হাতে চাবি দিলেন।

ডাকাতেরা ঘর খুলে বাক্সগুলো খুলে ফেলল। নগদ টাকা, গহনা কাপড় চোপড় সমস্ত বার করে বেঁধে নিল।

এদিকে গোলমাল শুনে গ্রামের লোকেরা সতর্ক হল। ডাকাতদের বাধা দেবার জন্য দল বেঁধে আসবার চেষ্টা করল, কিন্তু বাড়ীর বাইরেও ডাকাতদের সতর্ক পাহারা ছিল, তারা গ্রামের লোকদের ওপর ইটপাথর ছুঁড়তে লাগল। চিৎকার করে বলতে লাগল—এখান থেকে পালাও, না হলে গুলি করে মারব।

অসহায় গ্রামবাসী পিছু হটতে লাগল।

ডাকাতেরা লুটের মাল নিয়ে পালিয়ে গেল।

শিবশঙ্কর আর তাঁর বাড়ীর লোকেরা ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন।

তাঁদের সামলে ওঠার আগেই আবার ডাকাতদের দল ফিরে এল। একটা বিরাটদেহ ডাকাত শিবশঙ্করের গলায় তলোয়ার লাগিয়ে বলল—বল কোথায় পুঁতে রেখেছিস সোনাদানা—এক্ষুনি বল, না হলে মাথা কেটে ফেলব।

শিবশঙ্কর কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে বললেন :

—প্রাণে মেরোনা বাবা, বলছি······

কম্পিত আঙ্গুলের ইশারায় দেওয়ালের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো দেখিয়ে দিলেন—ঐখানে পোঁতা আছে ধন রত্ন সোনা চাঁদি।

ডাকাতরা চটপট দেওয়াল খুঁড়ে রূপার টাকা, সোনার গহনা মোহর সমস্ত বার করে একটা কম্বলে বেঁধে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সব মিলিয়ে ছত্রিশ হাজার টাকারও বেশী ডাকাতেরা লুট করে নিয়ে গেল।

শিবশঙ্কর ও তাঁর পরিবার বর্গের ওপর একই দিনে দ্বিতীয়বার চোট পড়ল, প্রথমে মায়ের মৃত্যু এবং সেই রাত্রেই ডাকাতি।

বিসরা থানায় পরদিন বিকেলবেলা এই ডাকাতির খবর পৌঁছাল। দারোগা কয়েকজন কনষ্টেবল নিয়ে সাজোজোদা গ্রামে রওনা হলেন।

পুলিস অফিসারকে দেখে শিবশঙ্করের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাঁর কান্না দেখে অফিসার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—শান্ত হোন, ডাকাতদের ধরবার সবরকম চেষ্টা আমরা করব। একটু শান্ত হয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

জোর তদন্ত শুরু হল। গ্রামের অনেক লোককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। বাড়ীর আনাচ কানাচ খুঁজে দেখা হল কিন্তু এমন একটি জিনিষও পাওয়া গেলনা যাতে ডাকাতদের ধরার কোন উপায় হয়।

সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকে পুলিস অফিসার অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটা কথা হঠাৎ বিদ্যুতের মত তাঁর মনে চমক দিয়ে গেল। হেড কনষ্টেবলকে ডেকে বললেন,—গ্রামে আসবার সমস্ত রাস্তাগুলোয় তিনচারজন করে সেপাই পাঠাও। পথের ধারে যত ঝোপঝাড়, গাছপালা গর্ত আছে সমস্ত জায়গা খুঁজে দেখ। যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যাতে ডাকাতরা কোন পথে আসা যাওয়া করেছে তার একটা হদিশ মেলে, আমায় তখনই জানাও। বুঝতে পেরেছ?

হেড কনষ্টেবল ছোট ছোট দল করে রাস্তায় অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিল।

একটু পরেই একজন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল—হুজুর এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে একটা ঘন মহুয়া গাছের তলায় কতকগুলো পোড়া বিড়ি আর দেশলাই এর কাঠি পড়ে আছে।

কথা শুনেই অফিসার খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—চল আমার সঙ্গে, দেখব জায়গাটা।

সেখানে পৌঁছে যা দেখলেন তাতে দৃঢ় অনুমান হল যে ডাকাতরা ঐখানে থেমেছিল, কিন্তু লুটের মালের কোন চিহ্নই রেখে যায়নি তারা। কেবল পোড়া আধপোড়া বিড়ি আর দেশলাইএর কাঠি পড়ে আছে।

—এটা কি ? দূরে এক টুকরো কাগজ দেখে পুলিস অফিসার চট করে গিয়ে তুলে নিলেন সেটা।

একটা ছেঁড়া খামের টুকরো।

খুব মনোযোগ সহকারে সেটা দেখলেন। সেটার ওপর বিহারের খুঁটী ডাকঘরের ছাপ ছিল। পকেটে রাখলেন টুকরোটা। তারপর গাছের তলাটা আবার খুব ভাল করে দেখলেন আর কিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু আর কিছুই পাওয়া গেলনা।

অফিসার নিরাশ হলেন না। ভাবলেন ডাকাত ধরবার একটা সূত্র পেয়ে গেছেন যেটা তাঁর পকেটের মধ্যে সুরক্ষিত।

সেই রাত্রেই একদল পুলিস খুঁটী অভিমুখে রওনা হল। স্থানীয় পুলিসকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। খুঁটীর দুই মাইলের মধ্যে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো আর কিছু রেজকীও পাওয়া গেল।

বেশ অনুমান করা যায় যে এইখানেই ডাকাতেরা লুটের মাল ভাগ করেছে।

শাদা পোশাকে পুলিস খুঁটীর কাছাকাছি গ্রাম এবং বাজার গুলোয় ঘুরতে লাগল।

ডাকাতির আটদিন পর। খুঁটীপুরের বাজারে হৈ চৈ, তাড়িখানায় খুব ভিড় জমেছে। দোকানে তিনটে লোক একসঙ্গে ঢুকল। খুব করে তাড়ি খেয়ে তারা নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে তর্ক, গালাগাল আরম্ভ করে দিল।

একজন বলল—কিছু শুনেছো নাকি···ঐ যে ঝাকন···আরে সেই ঝাকন··· চিরমাথার ঝাকন···শালা দশটা টাকা দিয়ে আটটা রূপোর টাকা আর চেন··· হ্যাঁ হ্যাঁ রূপোর চেন কিনেছে—কিনতে হলে এইরকম কিনতে হয়।

অপর জন জিজ্ঞাসা করে—কার কাছ থেকে কিনল ?

—আরে ঐ সুকুর পৈকা আছে না, তারই কাছে কিনেছে। তুমিও কিনে নাও, একেবারে লাল হয়ে যাবে।

তাড়ির দোকানে বসে সাদা পোশাক পরা পুলিস খুব মন দিয়ে তাদের কথাগুলো শুনছিল।

পুলিস ঝাকনের ঘর সার্চ করল, রূপোর টাকা আর চেন পাওয়া গেল।

সুকুরকেও পুলিস গ্রেপ্তার করল। তার ঘর সার্চ করে রূপোর টাকা আর কিছু কাপড় চোপড় পাওয়া গেল—যেগুলো ডাকাতি হয়েছিল।

সুকুর পৈকাকে জেরা করে সব জানা গেল। সে ধরা পড়ে গিয়ে আর কোন উপায় না দেখে অপরাধ স্বীকার করল। সে বলল—শিবশঙ্করের বাড়ীতে ডাকাতির ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল রামপাল পৈকা। সেই নিজের আঠারোজন সঙ্গী সাথী নিয়ে দল বাঁধে। এরা শিবশঙ্করের বাড়ীর সব খবর গ্রামের লোকেদের কাছেই যোগাড় করেছিল।

সুকুরের মারফৎ যাদের নাম জানা গেল পুলিস তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করল। তাদের ঘর সার্চ করে প্রায় দশহাজার টাকার মাল উদ্ধার হল। ষোলো জনের বিরুদ্ধে পুলিস ডাকাতির অভিযোগে মামলা করল। আদালতে সকলেরই কঠিন সাজা হল।

ছেঁড়া খামের একটা মাত্র টুকরো এবং দক্ষ পুলিস অফিসারের বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতায় ডাকাতের দলের বিনাশ সম্ভব হল।

হোটেলের চোর

হায়দ্রাবাদের তাজমহল হোটেলে সাধারণতঃ বড়লোকেরাই থাকতে পারে। বড় বড় অফিসার, বড় ব্যবসায়ী বা বিদেশী যাত্রীরা এই হোটেলে ওঠে। হোটেলের জাঁকজমক ও নানারকম আড়ম্বর দেখে সাধারণ লোকে সেখানে উঠতেই সাহস করে না।

ব্যাঙ্গালোর থেকে এক ধনী ব্যবসায়ী শ্রী মোহন হামাদী তাজমহল হোটেলে উঠবেন ঠিক করলেন। হোটেলের পঁয়তাল্লিশ নম্বর কামরায় হামাদী নিজের মালপত্র রাখিয়ে নিজের কাজে হায়দ্রাবাদের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন। ফিরতে রাত নটা হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের কামরাতে শুয়ে পড়লেন। সারাদিন কাজে ঘোরা ফেরায় ক্লান্ত ছিলেন, শীঘ্রই গভীর নিদ্রামগ্ন হলেন।

পরদিন ভোর ছটায় ঘুম ভাঙ্গল। দোর খুলতে গিয়ে হামাদী দেখলেন সেটা বাইরে থেকে বন্ধ, বিস্ময়ে হতবাক তিনি। তারপর ঘরের দিকে নজর পড়তেই দেখলেন তাঁর জিনিষপত্র সব মেঝেয় ছড়ান পড়ে আছে। ভাল করে দেখলেন, দামি ঘড়ি দুটো, ক্যামেরা, ফাউণ্টেন পেন, গরম স্যুট, টাকার ব্যাগ ইত্যাদি সব চুরি হয়ে গেছে। আতঙ্কে হামাদী দরজাটা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন, সেই শব্দ শুনে যখন হোটেলের চাকররা এসে বাইরে থেকে দরজা খুলে দিল, তখন তিনি কামরা থেকে বার হতে পারলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই হোটেলের পঁয়তাল্লিশ নম্বর কামরায় চুরি হওয়ার খবর সারা হোটেলে রটে গেল। হোটেলের ম্যানেজার শ্রী হামাদীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, ইতিমধ্যে সাতচল্লিশ নম্বর কামরা থেকে শ্রী রাজন খুব হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে বল্লেন—আমার ঘর থেকে কাপড় জামা, ঘড়ি, ব্যাগ সব চুরি হয়ে গেছে।

হোটেলের ম্যানেজারের তো আক্কেল গুড়ুম, এখন কি করবেন ? হোটেলে বড় রকমের চুরি এই প্রথম। ছুটো কামরা থেকে একই রাতে চুরি বেশ রহস্য-জনক। মজার কথা শ্রী হামাদী ও শ্রী রাজন নিজের নিজের কামরাতেই ঘুমোচ্ছিলেন অথচ চুরি হয়ে গেল। ম্যানেজার তখনই আবিদ রোডের থানায় টেলিফোন করে চুরির খবর দিলেন এবং তদন্তের জন্য পুলিস অফিসারকে অবিলম্বে হোটেলে আসতে অনুরোধ করলেন।

টেলিফোনে চুরির খবর পেতেই পুলিস অফিসার শ্রী রাঘবন কয়েকজন কনষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে এলেন। প্রথমেই তিনি ঐ কামরা ছুটো খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন, চুরিটা কি ভাবে হয়েছে অনুমান করবার জন্য। অপরাধী চুরির কোন প্রমাণই ফেলে যায়নি। কামরা ছুটোতেই দেখা গেল লাগোয়া বাথরুমের ভেন্টিলেটারের কাঁচ সরিয়ে চোর ঘরে ঢুকেছিল। বুঝলেন এ চোরের খুব ভাল করেই হোটেলের আনাচ কানাচ জানা আছে। তারপরই তাঁর সন্দেহ পড়ল হোটেলের কর্মচাবীদের ওপর। সম্ভবত কোন কর্মচারীর সাহায্যেই এই চুরি হয়েছে।

রাঘবন ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন—হোটেলে কতজন পাহারাওলা আছে ?

হোটেলের ম্যানেজার বললেন—রাত্রে ছুজন চৌকিদার পাহারায় ছিল।

শ্রী রাঘবন চৌকিদার এবং হোটেলের কর্মচারীদের ডেকে অনেকরকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করলেন, কিন্তু কোন ফল হলনা। হোটেলের কেউই কোন অজ্ঞাত লোককে হোটেলে দেখেনি।

চুরির কোন সুরাহাই যখন করতে পারলেন না তখন চিন্তামগ্ন রাঘবন ম্যানেজারের ঘরে পায়চারী করতে লাগলেন। এ চুরিতে কার হাত ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। সব মিলিয়ে হোটেলে প্রায় একশো ঘর, এবং প্রত্যেক ঘরে কোন না কোন প্রতিষ্ঠাবান ধনী এসে উঠেছেন।

হোটেলে অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম ঠিকানাগুলো দেখবার জন্য

শ্রী রাঘবন ম্যানেজারকে বললেন—দয়া করে আমায় আপনাদের রেজিষ্টারখানা দেখাতে পারেন কি ?

রেজিষ্টারে অধিকাংশ নামই এমন সব প্রসিদ্ধ লোকের যে তাঁদের কাউকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। রেজিষ্টার দেখতে দেখতে রাঘবন একটা নাম দেখে একটু সজাগ হলেন। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন—তেতাল্লিশ নম্বর কামরায় কে আছেন ?

ম্যানেজার রেজিষ্টার দেখতে দেখতে বললেন—এই ঘরে শ্রী অশোক কুমার ছিলেন।

—কোথা থেকে এসেছিলেন তিনি ?

—ছুদিন আগে নাসিক থেকে এসেছিলেন।

—হোটেল থেকে কবে গেলেন ?

—আজ ভোরেই গেছেন।

—কখন ?

—ভোর সাড়ে চারটের সময়।

—আজ ভোরে হোটেল ছাড়ার কথা আগে থেকে অশোক কুমার কি আপনাকে জানিয়ে রেখেছিলেন ?

প্রশ্ন শুনে ম্যানেজার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন—হোটেল থেকে যাবার হলে একদিন আগেই জানিয়ে দেওয়ার নিয়ম, তবে অশোক কুমার কোন বিশেষ দরকার বলে হঠাৎ চলে গেছেন, আগের দিন জানাতে পারেন নি। ...আবার একটু চিন্তা করে ম্যানেজার বললেন—কিন্তু কেবল এই জন্মে তাঁর ওপর সন্দেহ করার কোন কারণ দেখছি না। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তাছাড়া তিনি বেশ বড় সরকারী চাকুরে।

অশোক কুমারের সম্বন্ধে পুলিস অফিসার ম্যানেজারের কথাগুলো বেশ মন দিয়ে শুনছিলেন। হোটেল রেজিষ্টারে অশোক কুমারের নামের পাশে লেখা. ছিল গভর্ণমেন্ট অফিসার, তবুও রাঘবনের মনের সন্দেহ দূর হলনা।

জিজ্ঞাসা করলেন—এত ভোরে হঠাৎ তিনি হোটেল থেকে গেলেন কি জন্যে ?

অশোক কুমারের সম্বন্ধে ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে ইতিমধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল। ম্যানেজার রিসিভার তুললেন :

—তাজমহল হোটেল।

—অশোক কুমারের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?

—একটু অপেক্ষা করুন। ম্যানেজার রিসিভারটায় হাত দিয়ে চাপা দিয়ে পুলিস অফিসারকে বললেন—কোন লোক টেলিফোনে অশোক কুমারের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

রাঘবন তাঁর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কার সঙ্গে কথা বলতে চান ?

—শ্রী অশোক কুমারের সঙ্গে।

—তিনি একটু বাইরে গেছেন। আপনি দয়া করে আপনার নাম ঠিকানা জানিয়ে দিলে হোটেলে ফিরলে আমরা তাঁকে জানিয়ে দিতে পারি।

—আমার নাম হরি প্রসাদ, আমি হিন্দী প্রচার সভায় কাজ করি।

টেলিফোন রেখে রাঘবন শাদা পোশাকে সোজা হিন্দী প্রচার সভার কার্যালয়ে পৌঁছলেন। হরি প্রসাদের সঙ্গে একান্তে কথাবার্তায় রাঘবন জানতে চাইলেন—আপনিই কি একটু আগে অশোক কুমারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না! হরিপ্রসাদের স্বর একটু ঝাঁজাল।

—আমি অশোক কুমারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম—হোটেলে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আজ ভোরেই তিনি বাইরে গেছেন। তাই আপনার কাছে এলাম। ভাবলাম আপনি সম্ভবত তাঁর আসল ঠিকানা জানেন।

—বাইরে কি করে যাবেন তিনি ? আজ সকালেই তো তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে আমার কথা হয়েছে, আমাকে জানিয়েছেন আরও দু একদিন এখানে থাকবেন—

হরিপ্রসাদের কণ্ঠে বিস্ময়। একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, কি দরকার ?

—একটু প্রাইভেট কাজ। রাঘবন বললেন।

—দেখুন আপনি যখন আমার কাছে এসেছেন, আপনাকে খুলেই বলি, তার সঙ্গে বেশী মাখামাখি করবেন না।

—কেন ? রাঘবন খুব অবাক হবার ভান করলেন।

—এমনিতে সে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়, কিন্তু আপনি বোধ হয় এখনও তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। সে প্রতারণা করে বেড়ায়। চালচলন ভাল নয় বলে তার মা বাপ তাকে আলাদা করে দিয়েছে।

—তাই নাকি ? আমি তো এসব কিছুই জানি না। তাহলে তো দেখছি আপনার সঙ্গে দেখা করে ভালই হল।···আচ্ছা এবার তবে উঠি, পরে আবার দেখা হবে।

অশোক কুমারের সম্বন্ধে এইটুকু জানতে পেরেই তার উপর রাঘবনের সন্দেহ আরও গাঢ় হল। এখন তাঁর প্রথম কর্তব্য অশোক কুমারকে খুঁজে বার করা। হরিপ্রসাদের কথায় তাঁর অনুমান দৃঢ় হল যে সে হায়দ্রাবাদেই আছে।

হায়দ্রাবাদের সমস্ত বড় হোটেলগুলোয় খোঁজ নেবেন ঠিক করলেন রাঘবন। হায়দ্রাবাদে বড় হোটেলের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় কিন্তু পুলিস প্রত্যেকটি হোটেলে গিয়ে রেজিষ্টার দেখে খোঁজ নিতে শুরু করল। বেশ কয়েকটা হোটেল ঘুরে রাঘবন বিকেল চারটের সময় সুলতান বাজারের তাজমহল হোটেলে পৌছলেন। একই নামের হোটেল, এটা কেবলমাত্র যোগাযোগই বলা যায়। হোটেল রেজিষ্টারে আঠারো নম্বরের কামরার লোকের নাম দেখে চমকে উঠলেন, ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন—আঠারো নম্বরে কে আছেন ?

—অশোক কুমার।

—কবে এসেছেন তিনি ?

—আজ ভোর প্রায় পাঁচটা হবে।

—এখন কোথায় ?

—ঘরেই আছেন।

শ্রী রাঘবন অবিলম্বে হোটেলের কামরার মধ্যেই অশোক কুমরাকে গ্রেপ্তার করলেন। কামরা সার্চ করে তার কাছে চুরির সমস্ত মালই উদ্ধার হল। জেরার ফলে জানা গেল তার প্রকৃত নাম নববর্ষ লাল। হায়দ্রাবাদে আসার আগে সে নাসিকের একটা বড় হোটেলে ছিল। সেখানেও সে ঠিক এইভাবেই চুরি করেছিল। চুরির মালের মধ্যে চামড়ার একটা স্যুটকেশও ছিল অশোক কুমার নাম লেখা। তাই হায়দ্রাবাদের হোটেলে নিজের নাম সে অশোক কুমার লিখিয়েছিল।

পুলিস এই অপরাধীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে কোর্টে মামলা দায়ের করল, আদালত থেকে তাকে প্রত্যেকটি চুরির জন্য কঠিন সাজা দেওয়া হল।

বিবাহের বিজ্ঞাপন

"কেন্দ্রীয় সরকারের বড় চাকুরে। মাসিক আটশত টাকা বেতন। পঁচিশ বছর বয়স্ক এক মারাঠী যুবকের জন্য পাত্রী চাই। পাত্রীর অভিভাবক পোষ্ট বক্স ১৮০ নয়া দিল্লীতে পত্র ব্যবহার করুন।" বিবাহের বিজ্ঞাপন।

বারসীর অধিবাসী শ্রী ডি. পি. সুলাখে বেশ কয়েক বছর ধরে কন্যা কুমুদিনীর জন্য যোগ্য পাত্র খুঁজছিলেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই তিনি ভাবলেন এই পাত্রের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহের প্রস্তাব করা যাক। পাত্রের মাসিক আয় ও ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখে সব দিক থেকে এ পাত্র বাঞ্ছনীয় বলে মনে হল।

পরিবারের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে বিবাহের প্রস্তাব করা আবশ্যক। সুতরাং শ্রী সুলাখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের পোষ্ট বক্সের ঠিকানায় কন্যা কুমুদিনীর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পত্র দিলেন। কদিন পরেই দিল্লী থেকে মধুকর সানে নামক এক ব্যক্তি চিঠির উত্তর দিয়ে লিখলেন যে মেয়েটিকে ভাল করে দেখে শুনেই বিয়ের প্রস্তাবে সে সম্মত হতে পারে।

চিঠি পেয়ে শ্রী সুলাখে বড় ছেলে গোপালের সঙ্গে কুমুদিনীকে দিল্লী পাঠাবেন ঠিক করলেন। গোপালকে ভাল করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন—জানই তো কুমুদিনীর বিয়ের জন্য আমরা কত চিন্তিত। আজ পর্যন্ত যত পাত্রের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে তাদের সকলের মধ্যে এই ছেলেটি সবদিক দিয়ে যোগ্য। ছেলে যদি দেখতে শুনতে ভাল হয় তবে যত শীঘ্র সম্ভব বিয়েটা হয়ে যাওয়াই ভাল।

—ঠিক আছে বাবা, আমি এ জন্য যথাসাধ্য করব। কিন্তু···

—কি?

—সে যদি জানতে চায় বিয়েতে আমরা কি দেব থোব···

—আমার মনে হয় বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করবার জন্য দেওয়া থোওয়ায় আটকাবে না। সে যদি দেওয়া থোওয়ার কথা তোলে তবে বলে দিও সব মিলিয়ে কুমুদিনীর বিয়েতে আমরা দশ হাজার টাকা খরচ করতে প্রস্তুত।

—ঠিক আছে বাবা। গোপাল মাথা নেড়ে সায় দিল।

—তাহলে তোমরা দুজনে কালই দিল্লী রওনা হয়ে পড়। আমি মধুকরকে তার করে তোমাদের দিল্লী যাওয়ার খবর দিয়ে দিচ্ছি।

গোপাল ও কুমুদিনী সকাল আটটায় দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছল। তাদের রিসিভ করবার জন্য মধুকর নিজেই ষ্টেশনে ছিল। পরিচয় হতেই মধুকর বলল :
—পথে কোন কষ্ট হয়নি তো ?

—না, বেশ আরামেই আমরা এসেছি···গোপাল উত্তর দিল।

—আপনাদের থাকবার জন্য মহারাষ্ট্র মণ্ডলেই ঘর ঠিক করে দিয়েছি আমি একা থাকি, তাই ভাবলাম আমার ওখানে আপনাদের কষ্ট হবে······।

—ভালই করেছেন, আমরা দুজন মহারাষ্ট্র মণ্ডলেই থাকব। গোপাল কৃতজ্ঞতা সহকারে উত্তর দিল।

—তবে আমি অফিস থেকে দু দিনের ছুটি নিয়েছি যাতে আপনাদের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় থাকতে পারি। মধুকর সঙ্গে সঙ্গে এও বলল—আপনারা বোধ হয় জানেন না ছুটি না নিলে আমি আপনাদের নিতে ষ্টেশনেও আসতে পারতাম না। আমার কাজটাই এমন যে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হয়।

—ছুটি নিয়েছেন আমাদের জন্য···ধন্যবাদ। না হলে কথাবার্তার সময়ও তো পাওয়া যেত না···কৃতজ্ঞ গোপাল বলল।

দুটো দিনের বেশীর ভাগ সময় মধুকরের সঙ্গে দিল্লী বেড়ানোতে বেশ কাটল গোপাল ও কুমুদিনীর। তাদের খাতিরে মধুকর খুব খরচা করল। কুমুদিনী সঙ্কোচ বশে বারণ করলেও মধুকর তাদের নিয়ে সিনেমা দেখাল, ভাল হোটেলে খাওয়াল। মধুকরের সুন্দর চেহারা, মিষ্টি ব্যবহার দেখে গোপাল ও কুমুদিনী

দুজনেই প্রভাবিত হল। কুমুদিনী মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল···ভাবল এর সঙ্গে বিয়ে হলে সে সুখী হবে।

তৃতীয় দিন খাবার সময় মধুকর জিজ্ঞাসা করল—তাহলে আপনারা আজই যাবেন, রাতের গাড়ীতে?

—হ্যাঁ, বাবাকে সেই রকমই বলা আছে, দেরী করলে বাবা চিন্তিত হবেন মিছিমিছি। গোপাল বলল।

মধুকর গম্ভীর হয়ে বলল—বেশ, তাহলে বিয়ের কথাটা স্পষ্ট করে বলে নেওয়াই ভাল। অবশ্য আমার কাছে বিয়ের অনেকগুলি প্রস্তাব এসেছে। কয়েকটাতে খুব বেশী টাকা পণ দেবারও প্রস্তাব আছে কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মত অন্য।

—আমিও আপনাকে দেওয়াথোওয়ার কথাটা স্পষ্ট করে বলব ভাবছিলাম। গোপাল কথার মাঝখানেই বলল। —বাবার ইচ্ছা এ বিয়েতে সব মিলিয়ে দশ হাজার টাকা খরচ করবেন।

—আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন। মধুকর একটু হেসে বলল। আমি মনের মত স্ত্রী চাই এইটাই আমার কাছে প্রধান। কুমুদিনীকে আমার ভাল লেগেছে। বাকী রইল পণের কথা—সে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা, গহনা কাপড়ের বদলে যদি নগদ টাকা বেশী পাওয়া যায় তবে নিজের পছন্দমত দরকারী জিনিষ কিনে নিতে সুবিধা হয়।

—ভালই। আমার বিশ্বাস বাবা এ প্রস্তাবে রাজী হবেন। কুমুদিনীর দিকে তাকিয়ে গোপাল বলল।

দুমাস পরে মহারাষ্ট্রের রীতি রেওয়াজ মত কুমুদিনী ও মধুকরের বিয়ে হয়ে গেল। নগদ পাঁচ হাজার টাকা মধুকরকে দেওয়া হল, বাকী পাঁচ হাজারের জিনিষপত্র গহনা ইত্যাদি। কন্যা জামাইকে বিদায় দিয়ে শ্রী সুলাখে নিশ্চিন্ত হলেন।

কুমুদিনী দিল্লীতে কমলা নগরের এক ফ্ল্যাটে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে লাগল।

বছর খানেক খুব সুখেই দিন কাটল তার। ইতিমধ্যে কুমুদিনী গর্ভবতী হল, প্রসবের সময় হয়ে এলে একদিন মধুকর বলল—মনে হয় এখানে প্রসবের সময় তোমার কষ্ট হবে।

—কিন্তু অন্য উপায় কি? কুমুদিনী বিস্মিত হয়ে বলল।

—প্রথম প্রসব, দেখা শোনা, যত্ন আত্তির দরকার। আমার মনে হয় কয়েক মাসের জন্য বাপের বাড়ী গেলে অনেক আরাম পাবে। মধুকর বুঝিয়ে বলে।

—ভালই, তবে আমি একা বাপের বাড়ী যাবনা, তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে।

—তথাস্তু। তোমায় আমি বারসীতে রেখে আসব। জানই তো বেশী-দিনের ছুটি পাবনা। তবে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তোমায় দেখে আসব। মধুকর স্ত্রীকে বলল।

কুমুদিনীকে বারসীতে রেখে মধুকর দিল্লী ফিরে এল। মাঝে মাঝে পাঁচ ছয় দিনের ছুটি নিয়ে সে বারসী যেত। কুমুদিনীর একটি সুন্দর ছেলে হল। মধুকর তাকে বলল যে সে আরও কিছুদিন বারসীতেই থাকলে ভাল হয় যাতে ভাল করে সেরে উঠতে পারে। তারপর সে এসে কুমুদিনীকে দিল্লী নিয়ে যাবে।

গোপালের ছেলেবেলার এক বন্ধু জি. পি. সোপাল বারসীতেই থাকে। সেবার সে এল. এল. বি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। রোজই সে গোপালের সঙ্গে দেখা করতে আসে। এই সূত্রে মধুকর ভগ্নীপতির সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিল। বারসী এলেই সোপাল মধুকরের সঙ্গে দেখা করত। একদিন কথায় কথায় মধুকর সোপালকে জিজ্ঞাসা করল—ল' পাশ করে কি করবেন ঠিক করেছেন?

—ওকালতী করবার ইচ্ছা নেই। একটা ভাল মত চাকরী জুটলে চাকরীই করতে চাই আমি। সোপাল উত্তর দেয়।

—ভাই, আজকাল বিনা সুপারিশে ভাল চাকরী পাওয়া কঠিন। আমি নিজে অ্যান্টিকরাপশন বিভাগে কাজ করি, সরকারী চাকরীর কাণ্ডকারখানা আমার ভালভাবেই জানা আছে।

মধুকরের কথায় উৎসাহিত হয়ে সোপাল একটু ইতস্তত করে বলে—আমি আপনাকে চাকরীর কথা বলব ভাবছিলাম কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। আমার মনে হয় আপনার সাহায্য পেলে আমার একটা চাকরী হয়ে যায়…

—ভাই, আজকাল চাকরী দেওয়ানো তুমি যত সহজ ভাবছ তত সহজ নয়। যদিও আমাদের ডিপার্টমেণ্টেই চাকরী খালি আছে, চাকরীতে লোক নেওয়ার ভারও আমারই ওপর কিন্তু তার জন্যে পুরো ফাইল তৈরী করতে হয়।

—তবু, আপনি ইচ্ছা করলে চাকরী আমি পেয়েই যাব।

—বেশ, তুমি আমায় একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে দিয়ে দাও। পরের বার দিল্লী থেকে যখন আসব তোমায় চাকরীর অবস্থা জানাব। মধুকর আশ্বাস দিয়ে বলে।

মাস খানেক পরে যখন মধুকর দিল্লী থেকে এল সোপাল আবার তার কাছে চাকরীর কথা তুলল। উত্তরে মধুকর চাকরী দেওয়ানর কতকগুলো অসুবিধার কথা তুলে বলল—আমাদের ডিপার্টমেণ্টেই একটা চাকরী খালি আছে শিলংএর ডেপুটি ডিরেক্টারের চাকরী, বেসিক পে সাড়ে ছ শ টাকা, কিন্তু এ চাকরী দেওয়ানোতে একটা অসুবিধা আছে…

উৎসুক কণ্ঠে সোপাল জিজ্ঞাসা করল—কি?

—ঐ চাকরীতে যাকে নিয়োগ করা হবে তাকে পনেরো হাজার টাকা জামিন রাখতে হবে।

—যেমন করে হোক এ চাকরীটা আমায় করে দিন আমি বাবাকে বলে জামিনের টাকা জমা করে দেব—সোপাল অনুনয় করে।

—বেশ, টাকাটা জমা করার পর চাকরীর ব্যবস্থা করা যাবে। জামিনের টাকাটা শীঘ্র জমা দেবার ওপরেই মধুকর জোর দিল।

ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সোপালের বাবা পনেরো হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে তার ড্রাফ্‌ট মধুকরকে পাঠিয়ে দিলেন। জামিনের টাকা জমা করার মাসখানেক পরেও যখন সোপালের চাকরীর নিয়োগপত্র এলনা তখন স্বাভাবিক ভাবেই সোপালের বাবা চিন্তিত হলেন। সোপাল ইতিমধ্যে কয়েকখানা চিঠি লিখে মধুকরকে তার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার পাঠাবার অনুরোধ করেছিল।

একদিন হঠাৎ সোপালের কাছে একটা তার এল তাতে লেখা ছিল যে সোপালকে ডেপুটি ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে যেন অবিলম্বে পুনায় গিয়ে কার্যভার গ্রহণ করে। কিন্তু এই তার পাবার কয়েক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় তার এল কোনো কারণ বশত তার নিয়োগের আদেশ রদ করা হয়েছে, পুনরায় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে যেন অপেক্ষা করে।

এই তার দুখানা পেয়ে সোপাল ও তার বাবা দুজনের মনেই সন্দেহ হল। কদিন পরে মধুকর যখন বারসী এল তার সেই টাকা অবিলম্বে ফেরত দেবার জন্য মধুকরকে অনুরোধ করল।

মধুকর প্রথমে অনিচ্ছায় এটা ওটা বলতে লাগল, কিন্তু পরে উপায় না দেখে দিল্লীর একটা ব্যাঙ্কে পনের হাজার টাকার চেক কেটে দিল। মধুকরের কথাবার্তার রকম সকম দেখে সোপালের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। আর কি করা উচিত বুঝতে না পেরে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে সে বারসীর থানায় মধুকরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লিখিয়ে দিল। এই রিপোর্টের বলে পুলিস সেইদিনই মধুকরকে গ্রেপ্তার করল।

জেরায় সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। মধুকরের আঁসল নাম মঞ্জর আলি কাজী। সে জলগাঁও-এর অধিবাসী। তার বাবা আব্দুল গফরকে যখন ছেলের গ্রেপ্তারের খবর দেওয়া হল তখন সে দশ হাজার টাকার জামিনে ছেলেকে খালাস করিয়ে নিল। জামিনে ছাড়া পেয়ে মঞ্জর আলি কাজী ফেরার হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর ধরে পুলিস তাকে ধরবার অনেক চেষ্টা করল। প্রায় বারো বছর পরে বোম্বাইএর শ্রী বি. জি. গোখলে পুলিসের কাছে রিপোর্ট

লেখালেন যে প্রভাকর মার্তণ্ড মারাঠে নামে একজন লোক তার বোন চম্পু বাঈকে সম্প্রতি বিয়ে করেছে। শ্রী গোখলে পুলিসকে জানালেন যে মারাঠে নিজেকে অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার বলে জানিয়েছে, কিন্তু তার চালচলন সন্দেহ জনক।

এই রিপোর্ট পেয়েই পুলিস খবর নিয়ে জানতে পারল অন্ধ্র প্রদেশে এ নামের কোন সরকারী অফিসার নেই। অবশেষে পুলিস অনেক চেষ্টায় মারাঠেকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করতে সফল হল। পুলিস তাকে বোম্বাই নিয়ে এল এবং দাগী অপরাধীদের ফটো মিলিয়ে সব রহস্যই প্রকাশ হয়ে গেল। আসলে মঞ্জর আলি কাজী, মধুকর সানে এবং প্রভাকর মার্তণ্ড মারাঠে একই ব্যক্তি। অনেক প্রমাণ জোগাড় করে তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও প্রবঞ্চনার অভিযোগে মকদ্দমা হল। আদালতে বিভিন্ন অপরাধের জন্য মঞ্জর আলি কাজীর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড আর আঠারো শ টাকা জরিমানা হল।

ট্রেনে হত্যাকাণ্ড

সাতাশী আপ প্যাসেঞ্জার সন্ধ্যা পাঁচটা ছেচল্লিশ মিনিটে ছাপরা থেকে বালিয়া ষ্টেশনে পৌঁছল। প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের কোলাহল। শ্রী চৌবের এই ট্রেনেই যাবার কথা ছিল, ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট। শ্রী চৌবে যখন ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাশের কামরা খোলবার চেষ্টা করলেন দেখলেন ভেতর থেকে তার দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিলেন তবু যখন খুলল না, তিনি গার্ডকে দরজা খুলিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন, বললেন—দয়া করে এই কামরার যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন তো, ভেতর থেকে এভাবে দরজা বন্ধ কবে রাখবার তাঁদের কি অধিকার আছে?

—একটু অপেক্ষা করুন আমি দরজা খুলিয়ে দিচ্ছি। গার্ড চৌবেজীকে ঠাণ্ডা করলেন।

কিন্তু তিনিও যখন চৌবেজীর মত দবজায় ধাক্কা দিয়ে খুলতে পারলেন না, তখন ট্রেন লেট হবার ভযে তাঁর বেশ রাগ হল।

পাশের কামরায় উঠে গার্ড গাড়ীর অপর দিকে গিয়ে দেখলেন সেদিকের দরজা খোলা। দরজাটা বাইরে থেকে ঠেলতেই খুলে গেল কিন্তু ভিতরে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে ভয়ে তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কামরার মেঝেতে রক্তের বন্যা বইছে এবং তার ওপর এক আহত রক্তাক্ত যাত্রী পড়ে ছটফট করছে।

ট্রেন ছাড়া স্থগিত রাখা হল। সেখানে ষ্টেশন মাষ্টার, টি টি এবং অন্যান্য যাত্রীদের ভিড় জমে গেল। ষ্টেশন মাষ্টার রেলওয়ে পুলিসকে জানালেন—৮৭ আপ ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাসের এক কামরায় এক যাত্রী আহত ও মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছে—অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা করুন।

এই খবর পাবামাত্র জি আর পির শ্রী পাণ্ডে কয়েকজন কন্সষ্টেবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। কৌতুহলী যাত্রীদের ভিড় হটাবার আদেশ

দিয়ে পাণ্ডে ষ্টেশন মাষ্টারকে বললেন যে কামরাটা ট্রেন থেকে কেটে রাখা হোক।

কামরাটা কেটে সাইডিংএ রাখা হল।

পুলিস অফিসার কামরায় ঢুকে দেখলেন আহত যাত্রীটি তখনও জীবিত রয়েছেন, প্রথমে মনে করা হয়েছিল তিনি মৃত। আহত যাত্রীকে একটু আরাম দেবার চেষ্টা করে পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করলেন—নাম ঠিকানা বলতে পারবেন?

—রামকুমার আগরওয়ালা, ত্রিলোচন ঘাট, বেনারস—বহু কষ্টে তিনি এইটুকু বললেন।

—আমায় ঘটনাটা কিছু বলতে পারবেন? পাণ্ডে আবার প্রশ্ন করলেন।

—ছুরি মেরেছে—চামড়ার ব্যাগ নিয়ে গেছে—টাকা জামা কাপড়···বলতে বলতে আগরওয়ালা অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

আগরওয়ালাকে তখনই হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল কিন্তু কয়েক ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ফেললেন।

পুলিসের সামনে জটিল সমস্যা। আগরওয়ালার মৃত্যুতে আততায়ী সম্বন্ধে তাঁর কাছে আর কোন খবর পাবার আশাও শেষ হয়ে গেল।

ট্রেনের কামরাটা ভাল করে অনুসন্ধান করা হল। রক্ত চেঁচে নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল। মৃত যাত্রীর কামরার পাশের কামরায় রক্তমাখা একটা ছোরা এবং একটা নোটবই পাওয়া গেল। ছোরার ওপর আঙ্গুলের ছাপ ছিল। পুলিসের বৈজ্ঞানিক বিভাগকে আবশ্যকীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ডাকা হল।

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত নোট বইএ নাম লেখা ছিল রমেশ কুমার সিংহ। তার ভেতরের পাতায় হিসাব লেখা ছিল। অন্যান্য হিসাব খর্চার এক জায়গায় লেখা ছিল রাজেন্দ্র টি ষ্টলে ধার পঞ্চাশ টাকা। নাম দেখে পুলিস অফিসার খুশী হলেন। একটা সূত্র পাওয়া গেল অন্তত। কিন্তু কোথাকার রাজেন্দ্র টি ষ্টল? স্থানের নাম নেই···যাই হোক আততায়ী সম্বন্ধে আর কিছুই

যখন জানা যায়নি তখন পুলিস ছাপরা, মজফ্‌ফরপুর, সোনপুর ও বালিয়া সহর গুলিতে রাজেন্দ্র টি ষ্টলের খোঁজ সুরু ক'রে দিল। সাদা পোশাকে পুলিস সহরের সমস্ত হোটেল গুলোতেও খোঁজ নিতে লাগল।

কয়েক দিন পরে পাণ্ডে খবব পেলেন মজফ্‌ফরপুরে ঐ নামে দুটো চায়ের দোকান আছে। খবব পাবামাত্র তিনি মজফরপুবে এলেন। সেখানকার চতুর্ভুজ পাড়ায় রাজেন্দ্র টি ষ্টল বোর্ড দেখে তাঁর খানিকটা আশা হল, হয়ত কিছু খবর পাওয়া যাবে।

ভেতবে ঢুকে একটা কোণের টেবিলে বসে চা খেতে লাগলেন। নানা রকম ভাবছেন কি ভাবে অপরাধী সম্বন্ধে ষ্টলের মালিকের কাছে কথাটা তোলা যায়। দোকানদার কাউণ্টারে বিল তৈরীর কাজে ব্যস্ত। একটু পরে যখন তার একটু ফুরসৎ হল তখন পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করলেন—কি শেঠজী···দোকান কেমন চলছে?

—ভালই চলছে। দোকানদার বিশেষ মনোযোগ দিলনা পাণ্ডের প্রতি।

পাণ্ডে গল্প জমাবার চেষ্টায় আবার বলেন—আজকাল চায়ের দোকানে তো দারুন লাভ।

—না বাবু, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। নগদ বেচাকেনায় তবু লাভ আছে, ধারের কারবারে তো দোকানের বারোটা বেজে যায়। দোকানদারীর ভেতরের কথা ফাঁস করে দিল দোকানদার।

—তা তো বটেই। আচ্ছা একটা খবর দিতে পার। একটি বাবু তোমার এখানে চা খেতে আসত···হ্যাঁ মনে পড়েছে নামটা—রমেশ কুমার সিংহ—কদিন ধরে তাকে দেখছি না···নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে পাণ্ডে বলেন।

—সিংহ বাবু? কেন আপনি তাকে চেনেন নাকি? দোকানদারের কথা-বার্তায় খানিকটা কৌতুহল দেখা গেল।

—হ্যাঁ চিনিতো, কেন কিছু হয়েছে নাকি?

—আর বাবু কি বলব? দোকানে পঞ্চাশ টাকা বাকী, আর আজ দু মাস

ধরে শোধ দেবার নাম নেই। গত দশ পনের দিন ধরে দোকানেও আসছে না। কোনদিন একটু সময় পেলে জেলে গিয়ে তাগাদা করব ভাবছি।

পাণ্ডের কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। তিনি দোকান থেকে সোজা মজফ্‌ফরপুর জেলে গেলেন। সেইখানে খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে রমেশ কুমার সিংহ জেলে কিছুদিন অস্থায়ী চাকরী করেছে কিন্তু গত মাসে তার সেখানকার চাকরী গেছে। তারপর থেকে তার আর কোন খোঁজ খবর নেই। খবর পেয়ে পাণ্ডে মোটেই নিরাশ হলেন না। তিনি জেলের অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে রমেশ কুমারের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। একজন ত তাঁকে জানাল যে রমেশ কুমারের এক কাকা রামকিষণ সিংহ ছাপরা জেলের ওয়ার্ডার।

এই খবরটা পেয়ে অপরাধীকে ধরবার জন্যে পাণ্ডে সেইদিনই ছাপরা রওনা হলেন। ছাপরা জেল থেকে খুব সাবধানে রামকিষণের কোয়ার্টারের ঠিকানা জোগাড় করলেন। তাঁর অনুমান রমেশ কুমার কাকার বাড়ীতে আছে। তার ঘরের চাকরানীর সঙ্গে কথা বলে পাণ্ডে জানতে পারলেন যে কিছুদিন যাবৎ রামকিষণের এক আত্মীয় তার বাড়ীতে আছে।

অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে দেরী করা উচিত হবেনা বুঝে কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে সেই রাত্রেই রামকিষণের কোয়ার্টার ঘিরে ফেললেন। বাড়ী সার্চ করা হল। অপরাধী রমেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করা হল।

পাণ্ডে রামকিষণের বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিষ সার্চ করলেন, তাঁর অনুমান মত চামড়ার ব্যাগ ও মৃত ট্রেন যাত্রী আগরওয়ালার অন্য জিনিষগুলোও পাওয়া গেল। রমেশ কুমারের একটা শার্ট ও প্যাণ্ট পাওয়া গেল যাতে রক্তের দাগ ছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে সেই রক্তের সঙ্গে মৃত যাত্রীর রক্তের গ্রূপ অভিন্ন। হিসাবের খাতার হস্তাক্ষর রমেশের নিজের বলে প্রমাণিত হল।

এইসব প্রমাণের সাহায্যে আদালতের বিচারে রমেশ কুমারের ফাঁসির সাজা হল।

হত্যা রহস্যের সূত্র

"আমার স্বামী শ্রী বাবুরাও ডোঙ্গরবাস গত মাসের পাঁচ তারিখ থেকে নিরুদ্দেশ! তিনি রহৌড়ী থেকে নাসিক রওনা হবার পর আর ফিরে আসেন নি অথবা তাঁর কোন খবর পাওয়া যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ জানালে সমুচিত পুরস্কার দেওয়া হবে—সুখুবাঈ, রহৌড়ী, আহমেদনগর।"

নাসিকের এক মারাঠী দৈনিকপত্রে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর বেশ কয়েকমাস কেটে গেল, কিন্তু বাবু রাওএর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এইভাবে তিনি অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই চিন্তিত হলেন। যতদিন যেতে লাগল তাঁদের দুশ্চিন্তা এবং সন্দেহ বাড়তে লাগল। সব উপায়ই যখন ব্যর্থ হল তখন বাবুরাও-এর এক নিকট আত্মীয় ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে থানায় তাঁর রহস্যপূর্ণ নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ডায়েরী লেখালেন।

প্রায় দশ মাস কেটে গেল তবু কিছুই করতে না পারায় মহারাষ্ট্র সরকারের তরফ থেকে মামলা ডিটেকটিভ পুলিস বিভাগের ওপর দেওয়া হল। বাবুরাও-এর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক বাবুরাও রহৌড়ীতে এক হোটেল চালাচ্ছিলেন। তাঁর বেশীর ভাগ সময় হোটেলের কাজেই কেটে যেত, রাত্রে সব কাজ সেরে তারপর বিশ্রাম করতেন। হোটেলের পাশেই দুটো ঘর ছিল, তাতে তিনি তাঁর যুবতী স্ত্রী সুখুবাঈকে নিয়ে থাকতেন। একথাও পুলিস জানতে পারল যে তাঁর সঙ্গে তাঁর এক বিধবা বোনও থাকত কিন্তু বাবুরাও-এর নিরুদ্দেশের পর সুখুবাঈ-এর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে তার নিজের গ্রামে ফিরে গেছে।

পুলিস ইন্সপেক্টর দেশপুত্রে সুখুবাঈ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে এলেন। সেখানে শ্রীপাদ বলে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। অফিসার সুখুবাঈকে

জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ বাবুরাও-এর এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কারণ কি বলতে পারেন কিছু ?

—আমি আর কি করে বলব দারোগাবাবু—কান্নাভরা স্বরে সুখুবাই বলতে থাকে—আমার কপাল পুড়েছে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা তিনি এমনভাবে হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন।

—আপনার সঙ্গে তাঁর কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল নাকি ? ইন্সপেক্টর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন।

—না, তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হওয়ার কথাই ওঠে না। তিনি আমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ক্রুটী রাখতেন না।—বাবুরাও-এর কথা বলতে বলতে সুখুবাঈ-এর কণ্ঠ রুদ্ধ হল, চোখে জল এসে গেল।

পুলিস অফিসার সুখুবাঈকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আপনি মনকে শান্ত করুন। বাবুরাও-এর অনুসন্ধানের কোন ক্রুটী আমরা রাখব না।

—তা তো জানি। কিন্তু দারোগাবাবু, আমার আর কোন আশা নেই যে তিনি ফিরে আসবেন। কত মাস কেটে গেল নিরুদ্দেশ হয়েছেন আজ পর্যন্ত একটা খবরও পাওয়া গেলনা।

—তবুও নিরাশ হবেন না···পুলিস অফিসার আবার একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা, হোটেল এখন আপনি চালাচ্ছেন কি করে ?

—শ্রীপাদ আর চাকর বাকরদের সাহায্যে কোন রকমে চালাচ্ছি।

—শ্রীপাদ কে ?

—শ্রীপাদ নগর-শুল্ক বিভাগে কাজ করে, আমার এই বিপদে সেই আমায় সাহায্য করছে। সুখবাঈ উত্তর দেয়।

—এখন তাহলে আমি উঠি। দরকার মত আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সুখুবাঈ-এর সঙ্গে কথা বলে একটা সন্দেহ ইন্সপেক্টর দেশপুত্রের মনে বার বার জাগতে লাগল,—সুখুবাঈ-এর সুখ সুবিধা, তার হোটেলের

পরিচালনা ব্যবস্থায় শ্রীপাদের এত মাথা ব্যথা কেন ? পুলিস সেইদিন থেকেই শ্রীপাদের গতিবিধির ওপর গোপনে কড়া নজর রাখতে শুরু করল। তিনচার দিনের মধ্যেই জানা গেল যে শ্রীপাদের বেশীর ভাগ সময় সুখুবাঈ-এর সঙ্গে কাটে। হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিস জানতে পারল বেশ কয়েক বছব ধরে সুখুবাঈ-এর সঙ্গে শ্রীপাদের অবৈধ সম্বন্ধ আছে।

এ তথ্যের গুরুত্ব পুলিস ভালভাবেই জানে, বাবুরাও-এর হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার মূলে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি যাতে অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত করা যায়, কিন্তু পুলিসের সন্দেহ তারই ওপর।

বাবুরাও-এর হোটেলে তিনজন চাকর কাজ করে, তাদের মধ্যে দুজন খুবই পুরোনো। বাবুরাওএর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ কববার জন্য পুলিস ইন্সপেক্টর তাদের কাছে গেলেন। বেশ কদিন ধরে অনেক চেষ্টার পর ইন্সপেক্টরকে একজন চাকর জানাল যে বাবুবাও শ্রীপাদ ও সুখুবাঈ-এর অবৈধ সম্বন্ধের কথা জানতে পেরেছিলেন। শ্রীপাদের এত আসা যাওয়া বাবুরাও মোটেই পছন্দ করতেন না এবং এজন্য কয়েকবার তিনি সুখুবাঈকে বকাবকি করেছিলেন। এই চাকরের কাছেই ইন্সপেক্টর আরও জানতে পারলেন যে নিরুদ্দেশ হবার পূর্বরাত্রে বাবুরাও হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়েছিলেন এবং সে রাত্রে সুখুবাঈ রামচন্দ্র নামক একটি চাকরকে সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

রামচন্দ্র হোটেলের সবচেয়ে পুরোনো চাকর। অশিক্ষিত এবং সাদাসিধা সরল প্রকৃতির মানুষ। ইন্সপেক্টর দেশপুত্র তাকে আড়ালে ডেকে বুঝিয়ে বললেন—তুমি নিশ্চয় বাবুরাও-এর ব্যাপারটা জান। সত্যি কথা বল···

—না বাবুজী, আমি কিছুই জানিনা। রামচন্দ্র উত্তর দিল।

—আচ্ছা সে রাত্রে বাবুরাওএর কিরকম অসুখ করেছিল, সুখুবাঈ কেন তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন ? জিজ্ঞাসা করলেন দেশপুত্রে।

—একদিন সন্ধ্যাবেলা 'মাল্‌কিন' (প্রভু পত্নী) আমাকে ধুত্‌রোর আরক

আর এক বোতল মদ আনতে বলেছিলেন। রামচন্দ্র বেশ ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিল।

—তারপর কি হল ?

—মূলা নদীর ধারে অনেক ধুত্রো গাছ আছে। আমি সেইখান থেকে একটা শিশিতে করে ধুতরোর রস জোগাড় করেছিলাম। ফেরবার পথে এক বোতল মদ কিনে, দুটো জিনিষই মালকিনকে দিয়েছিলাম। তারপর আর আমি কিছুই জানি না হুজুর।

—আচ্ছা বল সে রাত্রে সুখুবাঈ তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিল কেন ? পুলিস অফিসারের স্বর গম্ভীর।

—একথা আপনি মালকিনকেই জিজ্ঞাসা করবেন হুজুব। রামচন্দ্র ভয়ে ভয়ে বলল।

রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে বাবুরাও-এর নিখোঁজ হওয়ার রহস্য আরও ঘনীভূত হযে উঠল, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সূত্র সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের সামনে দেখা দিল যে সূত্র ধরে তারা কাজে অগ্রসর হতে পারবে। ইন্সপেক্টর দেশপুত্রের দৃঢ় অনুমান হল যে বাবুরাও-এর নিরুদ্দেশের মূলে সুখবাঈ-এর হাত নিশ্চয় ছিল।

দ্বিতীয়বার ইন্সপেক্টর সুখুবাঈকে জেরা করতে এলেন, এবার তাঁর ব্যবহার বেশ কঠোর। এসেই সুখুবাঈকে বললেন—এবার আপনি বিরহিনীর অভিনয় ছেড়ে দিন।

—আপনি এসব কি বলছেন ইন্সপেক্টর ? সুখুবাঈ নিজেকে সংযত করে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

—এইজন্য বলছি যে বাবুরাও-এর নিরুদ্দেশ হওয়ার মূলে আপনারই হাত ছিল এই সন্দেহে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ইন্সপেক্টর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

ভীত সুখুবাই কম্পিত স্বরে বললেন—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

—আপনি রামচন্দ্রকে দিয়ে ধুতরোর রস আনান নি? সে রাত্রে হঠাৎ বাবুরাও খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ায় রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠান নি?

শুনেই সুখুবাই-এর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। তবু তার বিশ্বাসই হলনা যে পুলিস তাব সব কথাই জানতে পেরেছে।

সুখুবাঈ-এর ঘাবড়ে যাওয়া দেখে ইন্সপেক্টর বুঝলেন এই সময় তার স্বীকারোক্তি পাওযা যাবে। বললেন—এখন বাবুরাও সম্বন্ধে সমস্ত কথা ঠিক ঠিক বলুন, তবেই আপনার মঙ্গল।

প্রশ্নবানে জর্জরিত সুখুবাঈ-এব পক্ষে আর নিজেকে চেপে রাখা কঠিন হল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আর আমি কোন কথাই গোপন করব না। পাপেব সাজা আমায় পেতেই হবে। বাবুরাওকে আমি হত্যা করেছি।

—কিভাবে হত্যা করেছেন?

—সে রাত্রে আমি স্বামীকে মদেব সঙ্গে ধুতরোর রস মিশিয়ে খাইয়েছিলাম—ভোর হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয।

—তারপর?

—আমি তখনই রামচন্দ্রকে ডেকে এই ঘরের মধ্যে যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে গভীর গর্ত খুঁড়িয়ে স্বামীকে চিরদিনের মত কবর দিয়ে দিলাম। এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

—বাবুরাও-এর মৃতদেহ কি এখনও ঐখানে পোঁতা আছে? পুলিস অফিসার বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন।

—না, কয়েকমাস পরে গর্তটা আবার খুঁড়িয়ে বাবুরাওএর অস্থিপঞ্জর মূলা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—তখনই ঘরের ঐ স্থানটি খুঁড়ে দেখা হল। খুব গভীর গর্তের মধ্যে কিছু হাড়, চুল, দাঁত ইত্যাদি পাওয়া গেল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য সেগুলো পুনা মেডিকেল কলেজে পাঠান হল। হাড় ও দাঁতের পরীক্ষায় মৃত ব্যক্তির

আয়ু এবং দৈর্ঘ সম্বন্ধে যা জানা গেল তা বাবুরাওএর আকার ও বয়সের কোন লোকের এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিলনা।

হত্যার এই রহস্যপূর্ণ মামলায় মৃতদেহ পাওয়া না যাওয়ায় পুলিসের পক্ষে অপরাধ প্রমাণ করা খুবই কঠিন হয়েছিল। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য, সাক্ষী ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত প্রমাণগুলির সাহায্যে এটা নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে বাবুরাওকে খুন করা হয়েছে এবং এই হত্যায় তার স্ত্রী সুখুবাঈ এবং হোটেলের দুজন চাকর জড়িত।

সকলের বিরুদ্ধে পুলিস হত্যার অপরাধে মামলা দায়ের করল। হাইকোর্টে অপরাধীরা নিজেদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করল তবু প্রাপ্ত প্রমাণের বলে সুখুবাঈ-এর আজীবন কারাদণ্ড এবং চাকর দুজনের দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। শ্রীপাদের অপরাধ প্রতিপন্ন হলনা, সে বেনিফিট অফ ডাউট, অর্থাৎ অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশে মুক্ত হল।

চোখের জলে যদি অপরাধীর মানসিক যন্ত্রণার সঠিক অনুমান করা সম্ভবপর হত তবে একথা উল্লেখ করা অবান্তর হবেনা যে আদালতে রায় শোনবার সময় সুখুবাঈ-এর চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরেছিল।

অদ্ভুত হত্যাকারী

কানপুর সহরে গত আট মাস ধরে একটা আতঙ্ক ছেয়ে গেছে। কানপটির ওপর কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে কে বা কারা মানুষ খুন করছে। কে এক অজ্ঞাত অপরাধী ঠিক একই ভাবে পঁচিশ জন ঘুমন্ত লোককে এক রহস্যপূর্ণ অস্ত্র দিয়ে কানপটির ওপর ভয়ঙ্কর আঘাত করে। আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু হয়েছে। হত্যাকারীকে কেউ দেখতে পায়নি এবং পুলিসও এমন কোন সূত্র খুঁজে পায়নি যাতে তাকে ধরা সম্ভব হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সকলের মনে নিরাপত্তার অভাব ও আতঙ্ক ছেয়ে গেল। অন্ধকার হতে না হতে লোকে ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ত।

নিরীহ মানুষকে এমন অদ্ভুত উপায়ে খুন করার ব্যাপারটা এত রহস্যময় যে এর উদ্দেশ্য কি হ'তে পারে তা কিছুই অনুমান করা গেলনা। ঘুমন্ত মানুষের কানপটিতে কোন অজ্ঞাত অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তাকে খুন করা এক অভাবনীয় অপরাধ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে ঘুমন্ত গরীব খেটেখাওয়া মজুর জাতীয় লোকেদের ওপরই খুনীর আক্রোশ যেন বেশী। আরও একটি রহস্যজনক ব্যাপার হল অধিকাংশ খুনই রবিবারে হয়।

খুনের সংখ্যা যতই বাড়ে লোকেদের মধ্যে ততই নানারকম উড়ো খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আতঙ্কগ্রস্ত লোকের বিশ্বাস হল অপরাধী বোধ হয় পিশাচসিদ্ধ, সেই জন্যই এতগুলো খুন করেও সে ধরা পড়েনি এবং তাকে কেউ চোখেও দেখেনি।

এক রবিবারের রাত্রে এই খুনী একসঙ্গে ছজন নিরীহ ঘুমন্ত লোককে ঠিক ঐভাবে আঘাত করল, তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে ছ'জনের মধ্যে কেউই চীৎকার করেনি এবং একবিন্দু রক্ত তাদের শরীর থেকে পড়েনি। প্রত্যেকের কানপটির ওপর একটা করে

চৌকো আঘাতের চিহ্ন। ময়না তদন্ত করেও অপরাধীর ঐ বিশেষ অস্ত্রটির সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা গেলনা।

অনেক হয়রানির পর উত্তর প্রদেশ সরকার এই অদ্ভুত খুনের তদন্ত করবার ভার ডিটেকটিভ পুলিসের ওপর দিলেন। আততায়ীকে খুঁজে বার করবার জন্য ডিটেকটিভ পুলিস সবগুলি খুনেরই বিস্তারিত অনুসন্ধান আরম্ভ করে দিল। সারা সহরে সাদা পোশাকে পুলিস হুঁশিয়ার এবং সক্রিয় হল। এতসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও সহরে হত্যার এইরকম ঘটনা বন্ধ হলনা। পুলিস এমন একটি সূত্রও আবিষ্কার করতে পারল না যাতে অপরাধী সম্বন্ধে কিছুটাও নির্ভরযোগ্য অনুমান করা যেতে পারে।

কানপুরের এই আশ্চর্য হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে পুলিসের তরফ থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল। এই বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান হল যে এই বিশেষ অপরাধীর কোন খোঁজ খবর পাবামাত্র তা যেন পুলিসের ডিটেকটিভ বিভাগে জানান হয়। প্রতিবেশী সবগুলি প্রদেশেই এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল।

কদিনের মধ্যেই মধ্য প্রদেশের গুনা নামক একটি জায়গা থেকে শ্রীপ্রতাপ সিংহ পত্র লিখে পুলিসকে জানালেন যে কয়েক বছর আগে গুনার এক মন্দিরে এক সাধু থাকত। সেই সাধু পথের ধারে ঘুমন্ত এক ব্যক্তিকে এইরকম আঘাত করেছিল। আদালতের বিচারে সাধুকে সাজাও দেওয়া হয়।

এই সূত্রটি পাবামাত্র একজন পুলিস অফিসারকে সাধুর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার জন্য গুনায় পাঠান হল। গুনার থানার পুরান রেকর্ড বার করে জানা গেল যে লছমন দাস নামে এক সাধু ঝাঁসী জেলার গোঁসাইপুর গ্রামে থাকত।

ঝাঁসীর গোঁসাইপুর গ্রামে অনুসন্ধান করে জানা গেল লছমন দাসের আসল নাম লছমী নারায়ণ, সে কয়েক বছর যাবৎ নিরুদ্দেশ। লছমন দাসের বিধবা মা গোঁসাইপুরে থাকে শুনে পুলিস অফিসার তাকে ছেলের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার বুঝে সেখানে উপস্থিত হলেন।

গোঁসাইপুর গ্রামে লচ্ছি নামে এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করলেন। সে জানাল যে তার বড় ছেলে লছমী নারায়ণ অনেক বছর থেকে নিখোঁজ। মাথার গোলমাল আছে বলে পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়সেও সে অবিবাহিত। কয়েক বছর আগে বৃদ্ধা শুনেছিল যে তার ছেলে সাধু হয়ে গেছে। সে এখন কোথায় আছে তা তার জানা নেই।

বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে লছমী নারায়ণের ঠিকানা পাওয়া গেলনা বটে, কিন্তু অনেক রকম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে পুলিস অফিসার তার কাছ থেকে লছমী নারায়ণের একটা পুরান ফটো আদায় করলেন।

সহরে ভ্রাম্যমান সাদা পোশাকের পুলিসদের কাছে সেই ফটোর কপি করিয়ে পাঠানো হল। কদিনের মধ্যেই বাকরগঞ্জ পাড়ায় এক কনষ্টেবল জানাল যে ঐ ফটোর চেহারার সঙ্গে মিল আছে এমন একজনকে সে একটা কুঁড়েঘর থেকে বার হতে দেখেছে।

খবর পেয়ে পুলিস ঐ কুঁড়ে ঘর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল। তার নাম বাবা লছমন দাস, তার চেহারাও ফটোর সঙ্গে মিলে গেল। তাকে জেরা করায় সে বলল যে মাত্র কদিন আগে সে কানপুরে এসেছে এবং সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। কুঁড়ে ঘর সার্চ করে কিছু কাপড় চোপড়, একটা ছোট তলোয়ার, একটা হাতুড়ি এবং একটা কুড়ুল পাওয়া গেল। ঐগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে তাতে রক্তের দাগও পাওয়া গেল।

শেষ অবধি বাঁচবার আর কোন পথ না দেখে লছমন দাস নিজের অপরাধ স্বীকার করে পুলিসকে জানাল যে ঘুমন্ত নির্দোষ লোকদের খুন করে সে আশ্চর্য রকমের আনন্দ পায়। সে আরও জানাল যে তার জন্ম রবিবারে হয়েছিল, তাই রবিবারেই সে বেশীর ভাগ লোককে আঘাত করেছে। তবে কিভাবে খুন করে তা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে ঘুমন্ত লোকের কর্ণপটাহের ওপর হাতুড়ির ঘা দিয়ে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে লোকের মৃত্যু হত। হাতুড়ি ও কুড়ুল সে নিজের জামার হাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখত।

নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যার অপরাধে লছমন দাসের বিরুদ্ধে পুলিস মামলা দায়ের করল। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হল সে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়। তার বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা গেলনা। কেন হত্যা করেছে তা বোঝা গেলনা কিন্তু তবু আদালতে তার ফাঁসির হুকুম হল। জজ মন্তব্য করেছিলেন যে, সকল ক্ষেত্রে অপরাধের উদ্দেশ্য প্রমাণিত হবেই এমন কথা বলা যায় না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে হত্যাকারী নির্দোষ ব্যক্তিদের হত্যা করে এক প্রকার পৈশাচিক আনন্দ লাভ করত।

চলন্ত মোটরে খুন

—ভাই, আজ বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে খান্নাকে সিংহ বলল।

—এই দারুন শীতে একটা ভাল রেস্তোঁরায় বসে কফি খেলে কেমন হয়? সুদ, তুমি কি বল? খান্না মুচকি হেসে দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল।

—আরে ভাই, একেবারে মনের কথাটি বলেছো—সুদ হাসতে হাসতে বলল—সবে সাড়ে এগারোটা বেজেছে। এখন কোনো ক্লাশ নেই, ইউনিভার্সিটীতে গিয়ে শুধু শুধু বসে থেকে কি লাভ? বরং চল একটা রেস্তোঁরায় বসে আড্ডা দেওয়া যাক।

—পাঁচজনের মত তো সিংহকে মানতেই হবে, ওর গাড়ীতে করে আমাদের কফি খাওয়াতে নিয়ে যেতেই হবে। ধিংড়া হেসে বলল।

—বেশ কথা—আমার একটুও আপত্তি নেই, চল যাওয়া যাক। সিংহ একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার তিন বন্ধু গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে বসে পড়ল।

দিল্লী বিশ্ববিত্থালয়ের গেট পার হয়ে সিংহের গাড়ী ফ্ল্যাগ স্টাফ রোডের দিকে মোড় নিল। নির্জন রাস্তায় গাড়ী বেশ জোরে চালাচ্ছিল সে। গাড়ীতে বসে চার বন্ধুতে মিলে হাসি ঠাট্টা চলছিল। খানিকটা গিয়ে সামনে বাদামী রংএর একটা অ্যামব্যাসাডার গাড়ী দেখা গেল। গাড়ীটা কাছাকাছি আসতেই সিংহ দেখতে পেল গাড়ীটার সামনের সিটে দুজন এবং পেছনের সিটে একজন বসে আছে। হঠাৎ নিজের গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে সিংহ পাশে বসা খান্নাকে বলল—দেখ দেখ সামনের গাড়ীতে কি হচ্ছে···

—আরে গাড়ীর মধ্যেই মারপিট হচ্ছে যে···স্পীড বাড়াও—খান্নার উৎকণ্ঠিত স্বর শোনা গেল।

সিংহ তার গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিল এবং পরক্ষণেই সামনে যে দৃশ্য

দেখল তাতে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইলনা। দ্রুতগামী অ্যামব্যাসাডার গাড়ীটার সামনের দরজা চকিতে খুলে গেল এবং সামনের সিটে উপবিষ্ট লোকটিকে আহত অবস্থায় রাস্তার ধারে ঠেলে ফেলে দিয়ে গাড়ীটা তীব্র বেগে পালাতে লাগল।

—সিংহ, স্পীড বাড়াও, দেখছ কি? খান্না চেঁচিয়ে বলল।

—ভাই, স্পীড ষাটের ওপর···কোন অ্যাক্সিডেণ্ট হয় যদি···

—হয় হোক, সামনের গাড়ীখানাকে পালাতে দিওনা···অ্যাক্সিডেণ্টের কথা ভেবোনা, স্পীড বাড়াও—পেছনের সীট থেকে ধিংড়া আর সুদ একসঙ্গে বলে উঠল।

খান্না সামনের গাড়ীর নম্বর নোট করে নিয়েছিল পি.এন.ইউ ৯১১৫। সিংহ য়্যাক্সিলেটারে চাপ দিল, দেখতে দেখতে দুখানা গাড়ীর দূরত্ব যখন খুব কম তখন হঠাৎ সামনের গাড়ীটা আলিপুর রোডের দিকে বেঁকে গেল। সিংহও নিজের গাড়ী আলিপুর রোডের দিকে চালাল। আর ঠিক এইভাবে দুটো গাড়ী আলিপুর রোড, যমুনা রোড এবং রিং রোড ধরে প্রায় একঘণ্টা চক্কর দিল।

সিংহের বন্ধুরা তাকে অনবরত উৎসাহিত করতে থাকে সামনের গাড়ী যাতে দৃষ্টির অগোচর না হয় তার জন্য। অবশেষে কিংস্‌ওয়ে ক্যাম্পে সিংহের গাড়ী পলায়মান গাড়ীখানার সামনে এগিয়ে গেল। গাড়ীটা পাঞ্জাবের দিকে পালাবার চেষ্টায় আরও স্পীড বাড়িয়ে দিল, কিন্তু আর একটা গাড়ীর সঙ্গে সেটার ধাক্কা লাগল। ফলে তার রেডিয়েটারটা ফেটে গেল। গাড়ী থামতেই ড্রাইভার লাফিয়ে নেবে মাঠের দিকে পালাতে লাগল। সিংহ আর তার বন্ধুরা মিলে গাড়ীটা ঘিরে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে রক্তাক্ত ছোরা হাতে একটা লোককে ধরে ফেলল।

একটু পরেই কিংসওয়ে ক্যাম্প থানার ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলে এসে পড়লেন। সিংহ তাঁকে দেখেই বলল—আগে ফ্ল্যাগ্‌স্টাফ রোডের লোকটিকে

হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তাকে এরা আহত করে গাড়ী থেকে ঠেলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

পুলিস অফিসার তখনই টেলিফোন করে কন্ট্রোলরুমে ঘটনার খবর দিলেন। পুলিসের গাড়ী ফ্ল্যাগ স্টাফ রোডে এসে পড়ল লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে। আহত লোকটির নাম ভগবান দাস, প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে মারা গেল। অজ্ঞান অবস্থায় থাকায় পুলিস তার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারল না।

কিংসওয়ে ক্যাম্পে সেই অ্যামব্যাসাডার গাড়ীর সামনের সিটে রক্তমাখা একটা থলিতে বত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। এছাড়া গাড়ীতে কিছু কাপড় জামা, দুটো জাল নম্বরের কার প্লেট এবং রঙের ডিবেও ছিল।

গাড়ীর মধ্যে সন্দেহজনক যে লোকটা ধরা পড়েছিল তাকে ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না যাতে ঘটনাটা পুরো জানা যেতে পারে। লোকটাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানা যায়। পুলিস অফিসার তাই তাকে জেরা সুরু করলেন—

—তোমার নাম কি ?

—অমর নাথ

—কি কাজ কর

—আমি এখানে একটা মোটর কোম্পানীতে কাজ করি

—তোমার সঙ্গের লোকটার নাম কি ?

—কমল

—এ গাড়ী কার ?

—আমি জানি না

উত্তর শুনে বোঝা গেল সহজে সে কিছুই স্বীকার করবে না। যতক্ষণ না অপরাধীর অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি হয় ততক্ষণ সে কেবল মিথ্যা কথা বলে অপরাধ লুকোতে চেষ্টা করে। পুলিস অফিসার সহানুভূতির সুরে বললেন—

দেখ গাড়ীতে রক্তমাখা ছুরি হাতে তুমি ধরা পড়েছ। এখন আর কোন কথা লুকিয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না। বরং সত্যি কথা বললে তোমার লাভ হতে পারে। আবার একটু পরে বললেন—আচ্ছা এ গাড়ী কোথা থেকে পেলে ?

—তিন চার দিন আগে আমরা এ গাড়ী কনট প্লেস থেকে চুরি করেছিলাম। কমলই সব প্ল্যান করেছিল, আমি তার ফাঁদে পড়ে গেলাম—অপরাধী আমতা আমতা করে বলল।

—কমল কি প্ল্যান করেছিল ? পুলিস অফিসারের স্বর বেশ সহানুভূতিপূর্ণ।

—অরি আমি কোন কথা লুকোতে চাইনা। কমলের পরামর্শে আমি একজন নির্দোষ লোককে খুন করে মহাপাপ করেছি—এর সাজা আমায় পেতেই হবে।···কথাগুলো বলে অমরনাথ একটু চুপ করল তারপর আবার বলতে লাগল—কমল আগে চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব রোডওয়েজ-এ চাকরী করত। সেখান থেকে চাকরী যাবার পর গত এক বছর ধরে সে ঐ মোটর কোম্পানীতে কাজ করছিল যেখানে আমি কাজ করি। একসঙ্গে কাজ করতাম, তার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্টতা হয়ে গেল।

—তারপর কি হল ?

—আমরা প্রায়ই নিজেদের অর্থকষ্ট নিয়ে আলোচনা করতাম। একদিন কথায় কথায় কমল বলল একটা গাড়ী পেলে আমাদের দারিদ্র্য দূর হতে পারে। আমি প্ল্যান জানতে চাইলে সে নিজের প্ল্যান খুলে বলল, শুনে আমি ভয় পেলাম এবং এই সব কাজ করতে পারবনা বলে দিলাম। কদিন ধরে কমল অনেক রকম করে আমায় রাজী করাতে চেষ্টা করল, শেষ পর্যন্ত আমি তার প্রলোভন থেকে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না।

উৎসুক পুলিস অফিসার প্রশ্ন করলেন—তারপর কি হল ?

—তিন চার দিন হল আমরা দুজনে কনট প্লেসে একটি অ্যামব্যাসাডার গাড়ী চুরি করলাম। সেই রাত্রেই আমরা দুজনে গাড়ীর নম্বর এবং রং বদলে ফেললাম। পাঞ্জাব সরকারের গাড়ীর মত তাতে 'পরিবহন বিভাগ, পাঞ্জাব

সরকার' লেখা হল। গাড়ী নিয়ে কাল কমল করোনেশন ডিপো গেল, ঐখানেই পাঞ্জাব সরকারের গাড়ী মেরামত হয়। সেখানে গাড়ীর সারভিসিং করে সে সন্ধ্যাবেলা ফিরল।

—ডিপো থেকে ফেরার পর সন্ধ্যায় তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ? পুলিস অফিসার কথার মাঝখানেই চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ, সে আমায় বলেছিল ডিপোর কোন কর্মচারী গাড়ী দেখে কোন সন্দেহ করে নি। আজ ভোরে কমল আবার সেই গাড়ী নিয়ে ডিপো গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে সে ডিপোর ক্যাশিয়ার ভগবান দাসকে তিস-হাজারীর রাস্তা জিজ্ঞাসা করল। ভগবান দাস তাকে জানিয়েছিল যে সে পাঞ্জাবের এক সরকারী অফিসার শ্রীগুপ্তর সঙ্গে দিল্লী এসেছে ও তাঁর আদেশ অনুসারে তাকে দুপুরের মধ্যে তিস্‌হাজারী পৌঁছাতে হবে। কমলের চাল সফল হল। ভগবান দাসকে টাকা জমা করতে তিস্‌হাজারী যেতে হবে, সে খুব খুশী হয়ে কমলের গাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

—তারপর ?

—কমল আমায় আগে থেকে ভাল করে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। ডিপো থেকে একটু দূরে নিধারিত স্থানে রাস্তার ধারে আমি তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দূর থেকে কমলের গাড়ী দেখেই আমি হাত তুলে গাড়ী থামালাম। জিজ্ঞাসা করলাম সে কোথায় যাচ্ছে, উত্তরে সে বলল তিস্‌হাজারী যাচ্ছে। আমিও বললাম আমায় তিস্‌হাজারী যেতে হবে······আমায় তার গাড়ীতেই নিয়ে যেতে অনুরোধ করলাম। কমল রাজী হতেই আমি পিছনের সিটে বসলাম।

—ভগবান দাস আপত্তি করেনি ? অফিসার জানতে চাইলেন।

—না, ভগবান দাসের কোন সন্দেহই হয়নি। অমরনাথ একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করল—রাস্তা নির্জন দেখে কমল গাড়ীটা ফ্ল্যাগ্ স্টাফ্ রোডে নিয়ে যাবার জন্য মোড় নিল। খানিকটা যাবার পরেই আগের প্ল্যান

মত কমল নিজের পকেট থেকে ছোরা বার করল আর ভগবান দাসের হাত থেকে টাকার থলিটা কাড়বার চেষ্টা করল। ভগবান দাস চিৎকার করে তাকে বাধা দিল, তখন কমল আমায় ইসারা করল, আমি পেছন থেকে ভগবান দাসের পিঠে ছুরি মারলাম। ভগবান দাস সিটেই গড়িয়ে পড়ল। দেখে কমল গাড়ীর স্পীড একটু কমিয়ে দিল আর আমরা দুজনে মিলে ভগবান দাসকে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দিলাম। নিজের অপরাধের এই নৃশংস কাহিনী শেষ করে অমরনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলল এবং অফিসারকে বলল—তারপরের কথা আপনি সবই জানেন।

কমলকে ধরবার জন্য অবিলম্বে চারিদিকে পুলিসের ফাঁদ পাতা হল। চণ্ডীগড় থেকে তার ঠিকানা জোগাড় করে পুলিস রাজেন্দ্র নগরে একটা বাড়ীতে তাকে গ্রেপ্তার করল। হত্যা ও লুটের অভিযোগে এই দু'জন অপরাধীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হল।

পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেলের সুপারিশে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র, পৃথ্বীপাল সিংহ, অরুণ খান্না, সতীশ সুদ ও কৃপাল ধিংড়া নিজেদের সাহস ও কর্তব্য পরায়ণতার জন্য রাষ্ট্রপতির অশোকচক্র পেয়েছেন।

ধুনীর কেরামতী

তিনজন ভক্ত শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করে বসে আছে।

—কে? তুলসীরামকে দাওয়ার ওপর উঠতে দেখে বাবাজী একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর দুটি চোখ মুদ্রিত।

—আমার নাম তুলসীরাম মহারাজ। তুলসীরাম দু হাত জোড় করে প্রণাম করে বলে।

বাবাজী চেয়ে দেখলেন আর বেশ অনেকক্ষণ ধরে এমন করে তাকে দেখতে লাগলেন যেন তার 'মনের ভেতর থেকে সব রহস্য টেনে বার করে নিচ্ছেন। তারপর তুলসীরামকে বসতে ইশারা করে গম্ভীর গলায় বললেন— তোর মন চঞ্চল হয়েছে বাবা!

তুলসীরাম মাথাটা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

—কি চাই তোর? ধন, সন্তান? বাবাজী আবার প্রশ্ন করলেন।

বাবাজীর প্রশ্ন শুনে তুলসীরাম খুব আশ্চর্য হল। তার দৃঢ় বিশ্বাস হল বাবাজী নিশ্চয় দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং তারই বলে তিনি তার মনের কথা জানতে পেরেছেন।

—বার কর দশ টাকা।

বাবাজীর কণ্ঠস্বর শুনে তুলসীর যেন চমক ভাঙ্গল। পরম আজ্ঞাবহ ভক্তের মত সে নিজের কোমর থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে বাবাজীর সামনে রেখে দিল।

বাবাজী নোটখানা ধুনির ছাইএর মধ্যে গুঁজে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। একটু পরে একমুঠো ছাই তুলসীরামের সামনে ফেলে দিলেন। তুলসীরাম তো দেখে তাজ্জব বনে গেল। বাবাজীর ফেলা ছাইয়ের মুঠোয় একটার জায়গায় দশ টাকার দশখানা নোট।

—এ কি মহারাজ…এ যে একশ টাকা। তুলসীরামের কণ্ঠে অপরিসীম বিস্ময়।

—এসব ধুনির কেরামতী। নিয়ে যা, হ্যাঁ, এসব কথা কাউকে বলবি না। বাবাজী তুলসীরামকে চলে যেতে আদেশ করলেন।

তুলসীরাম যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনা। পথে যেতে যেতে সে নোটগুলো বার করে আর বারবার গুনে দেখে, একখানা দশ টাকার নোটের জায়গায় এখন দশখানা দশ টাকার নোট তার কাছে পরম আশ্চর্য! বাবাজীর দৈব শক্তির এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে!

বাড়ী পৌঁছে তুলসীরাম বাবাজীর অলৌকিক শক্তির কথা জানাল তার স্ত্রীকে—তুমি ঠিকই বলেছিলে। রাধিয়া, বাবাজী তো দেবতা! তাঁকে যদি আমরা প্রসন্ন করতে পারি তাহলে আমাদের সব দুঃখ দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে।

তারপর থেকে তুলসীরাম বাবা নিরঞ্জন দাসের অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়ল, দিনরাত সে বাবাজীর সেবায় নিযুক্ত। স্ত্রী রাধিয়ারও দৃঢ় বিশ্বাস হল বাবাজীর দেওয়া বিভূতি পেলে বছরের মধ্যে সে সন্তানবতী হবে।

বাবাজী গ্রামে এক সপ্তাহেরও বেশী রইলেন। তুলসীরামের ভক্তি ও সেবায় প্রসন্ন হয়ে একদিন সন্ধ্যায় তাকে বললেন—বাবা, তোর সেবায় আমি প্রসন্ন হয়েছি। সাধু মানুষের এক ঠাঁই বেশী দিন থাকা ঠিক নয়। এবার স্থির করেছি এখান থেকে প্রস্থান করব। তোর যা কামনা এবার পূর্ণ করে নে।

—মহারাজ, যদি সত্যই প্রসন্ন হয়েছেন তবে এবার যেন আমার একটি সন্তান লাভ হয়। আমাদের নিঃসন্তান জীবনে কোন সুখ নেই—তুলসীরাম বিনয় নম্র কণ্ঠে বলে।

—চিন্তা করিস না, বিভূতি বৃথা হবে না। এক বছরের মধ্যে নিশ্চিতই সন্তান লাভ হবে তোর।

—মহারাজ, আরও একটি প্রার্থনা, কৃপা করে আমার জন্ম জন্মান্তরের দারিদ্র্য দূর করে দিন।

—সেটা বড় কঠিন কাজ। তার জন্য অনেক সাধনা চাই।

—আপনার দয়া হলে সব কিছু হবে মহারাজ—হাত জোড় করে তুলসীরাম মিনতি করে।

—বেশ তোর জন্যে আমি একবার সবকিছু করতে প্রস্তুত। তুই এক সঙ্গে যত পারিস টাকা কড়ি সোনা জোগাড় করে রাখ। আমি পরশু রাত্রে তোর ঘরে দেবীকে প্রসন্ন করবার জন্য পূজো করব। একটি কথা মনে রাখতে হবে—এ পূজোর খবর যেন গ্রামের আর কারও কানে না যায়—বাবাজী তুলসীরামকে সতর্ক করে দিলেন।

—তাই হবে মহারাজ, আমি আপনার কথামত ব্যবস্থা করব—সানন্দে তুলসীরাম বলে।

নির্দিষ্ট দিনে ভোর থেকেই সে পূজোর জোগাড় করতে লেগে গেল। স্ত্রী রাধিয়া ছাড়া গ্রামের আর কেউ কিছুই জানতে পারল না। রাত্রিতে ঠিক সময়ে তুলসীরাম মারুতি মন্দির থেকে বাবা নিরঞ্জন দাসকে নিজের ঘরে নিয়ে এল। উঠানে বাবাজী ধুনি প্রজ্জ্বলিত করলেন। এক ঘণ্টা ধরে চোখ বুজে ধ্যান করতে লাগলেন। বাবাজীর আদেশ অনুসারে উঠানে এক মণ গম জোগাড় করে রেখেছিল তুলসীরাম। সহসা বাবাজী চোখ খুলে চেয়ে দেখলেন, বললেন—বাবা, দেবী প্রসন্ন হয়েছেন, তোর কপাল খুলে যাবে। সোনা, টাকা কড়ি এসব কোথায় রেখেছিস ?

—এই নিন মহারাজ, তুলসীরাম একটা ছোট বাক্সে চার হাজার টাকা আর সোনার গয়না আগে থেকেই রেখেছিল।

বাবাজী বাক্স খুলে টাকা গহনা সব গমের মধ্যে গুঁজে রাখলেন। খানিক পরে বললেন…পূজার জন্য এবার কুয়ো থেকে শুদ্ধ জল নিয়ে আয়।

তুলসীরাম বাইরে গেল এবং কুয়ো থেকে এক বালৃতি জল তুলে নিয়ে এল। এসে দেখল বাবাজী ইতিমধ্যে সমস্ত নোট ও গয়না পুনরায় বাক্সটায় রেখে বন্ধ করে দিয়েছেন। পূজো শেষ করে বাবাজী বললেন—দেখ, এই

এই বাক্স ভাল করে রাখ, এক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত পূজো করবি। আগামী রবিবার এটাকে খুলে দেখবি স্বয়ং লক্ষ্মীকে পাবি।

পরদিন গ্রাম থেকে প্রস্থান করবার সময় বাবাজী তুলসীরামকে বললেন—আমি নাগপুর যাচ্ছি, আগামী রবিবার ফিরব তারপর আমার সামনে বাক্স খুলবি। রোজ পূজো করতে ভুলিসনে।

বাবাজী চলে গেলেন। তুলসীরাম খুব নিয়মমত ভক্তিভরে লক্ষ্মী পূজো করল। সপ্তাহ পূর্ণ হতে দেরী হলনা, রবিবার দিন ব্যগ্র ব্যাকুল তুলসীরাম সারাদিন বাবাজীর প্রতীক্ষায় রইল। রাত্রি হয়ে গেল তবু যখন বাবাজীর দর্শন নেই তখন তার ধৈর্য আর বাধা মানে না। সে বাক্সটা খুলে ফেলল। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। বাক্স একেবারে শূন্য। লক্ষপতি হবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে তুলসীরাম পথের ভিখারী হয়ে গেল।

হতাশ হয়ে তুলসীরাম শেষ পর্যন্ত খাপার থানায় গেল। পুলিস অফিসার শ্রী পাণ্ডে ঘটনার বিবরণ শুনে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ধূর্ত সাধুটাকে আমরা খুঁজে বার করবার জন্য যা কিছু করা সম্ভব সবই করব, কিন্তু তোমার সাহায্য চাই, না হলে হবেনা।

—আমি তো সর্বস্ব হারিয়েছি হুজুর। আপনি আমায় যা করতে বলবেন আমি তাই করতে রাজি। তুলসীরাম কেঁদে ফেলল।

পাণ্ডে খাপার রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। গ্রামের ছোট ষ্টেশনে এক বুড়ো কুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আট দশদিন আগে লম্বা জটাজুটধারী এক সাধুকে কি ষ্টেশনে দেখেছ তুমি?

মনে করতে চেষ্টা করল তারপর কুলি বলল—হ্যাঁ বাবুজী মনে পড়েছে। কদিন আগে ঐ রকম এক সাধু ষ্টেশনে ঘুরছিল।

—বলতে পারবে কোন ট্রেনে সাধু চড়েছিল? পাণ্ডে প্রশ্ন করেন।

খানিকটা ভেবে নিয়ে কুলি বলল—আমার মনে হচ্ছে ছিন্দওয়াড়ার গাড়ীতে চড়েছিল…

এই সূত্রটুকু পাবামাত্র পাণ্ডে ছিন্দওয়াড়ায় গিয়ে হাজির হলেন। ছিন্দওয়াড়া থানার রেকর্ড দেখে জানা গেল লিঙ্গা গ্রামের লহরগিরি গোঁসাই নামক এক সন্দেহজনক লোক সাধু বেশে লোককে ঠকিয়ে বেড়ায়। পুরান ফাইল ঘেঁটে একথাও জানা গেল যে এই লোকটার বিরুদ্ধে ছিন্দওয়াড়াতে দু তিনটে এইরকমভাবে লোক ঠকানোর মামলা আগে থেকেই চলছে।

লিঙ্গা গ্রামে ডিটেকটিভ পুলিস লহরগিরি গোঁসাইএর সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করল। গ্রামে খোঁজ খবর নিযে জানা গেল যে গোঁসাই গত সপ্তাহ থেকে নতুন সাইকেলের দোকান খুলেছে। এই খবর পেযে গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে কিন্তু আগে তাকে সনাক্ত করা দরকার। গদমী গ্রাম থেকে তুলসীরাম ও অন্য আরও দু-চারজন গোঁসাইকে দেখেই চিনে ফেলল। তুলসীরাম পুলিসকে জানাল যে সাধুর বেশে ঐ লোকটাই তার বাড়ীতে পূজো করেছিল।

গোঁসাইকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার কবা হল, তাব বিরুদ্ধে লোক ঠকানোর মামলা হল, আদালতে তার সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

কালো জার্সি, লাল ফুল

শীতের দিন। অনিতা রান্নাঘরের কাজ সেরে যখন ঘরে এল তখন সন্ধ্যা সাতটা। তার স্বামী পুরীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার। প্রায়ই বাড়ী ফিরতে তাঁর রাত দশটা হয়ে যায়। স্বামী ডিস্পেনসারী চলে যাবার পর বাড়ীতে থাকে শুধু অনিতা আর তার সাত মাসের খোকা বাবলু।

আজ বাবলুও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে বিছানায় শুইয়ে অনিতা বোনা নিয়ে বসল। সারাদিনের কাজে কর্মে ক্লান্ত হয়েছিল, তারও ঘুম আসতে লাগল।

হঠাৎ একটা লোক দু হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। সে খুব ভয় পেয়ে উঠে বসল।

—খবরদার যদি টুঁ শব্দটি করেছ—লোকটা তার মুখ জোরে চেপে ধরে বলল।

ইতিমধ্যে আর একটা লোক ধারাল ছোরা বার করে কড়া গলায় বলল—গয়না কোথায় আছে?

অনিতা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল তারপর কাঁপা গলায় বলল—আমায় ছেড়ে দাও, বলছি। চাবির গোছা আলমারীতে আছে, ঐ স্যুটকেসে গয়না আছে।

লোক দুটো আলমারী থেকে চাবির গোছা বার করে নিল, চামড়ার স্যুটকেস খুলতে লাগল। তাদের চাবি খোলার খট খট শব্দতেই বাবলু জেগে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে কান্না।

—বাচ্চাকে শীগগির থামাও, না হলে তাকে জন্মের মত চুপ করিয়ে দেব—ছোরা দেখিয়ে দ্বিতীয় লোকটা বলল।

অনিতা তাড়াতাড়ি বাবলুকে বুকে তুলে নিল। লোক দুটো স্যুটকেস

খুলে ফেলল, গয়না টাকা সমস্ত বার করে একটা থলিতে রাখল। যাবার আগে আবার একবার অনিতাকে ধমক দিয়ে বলল—বাঁচতে চাও তো চুপচাপ এইখানেই বসে থাক—

তারপর দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বাইরে থেকে দোরে শেকল লাগিয়ে লোক দুটো রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অনিতা এত ভয় পেয়েছিল যে বেশ কিছুক্ষণ সে ছেলেকে বুকে নিয়ে একভাবে পাথরের মত স্থির হয়ে বসে রইল। প্রায় পনের মিনিট এইভাবে কাটার পর তার সম্বিৎ ফিরে এল, ঘরের মধ্যে থেকেই চিৎকার করতে লাগল—বাঁচাও বাঁচাও।

তার আর্ত চিৎকার শুনে পাশের বাড়ীর শর্মা দৌড়ে এলেন। ঘরের শিকল খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন ঘরের মেজেয় কাপড় জামা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর দেরী হলনা। অনিতাকে সাহস দিয়ে শর্মা বললেন—এত ভয় পাবেন না। ভয় কি? আমি এখনই আপনার স্বামীকে টেলিফোন করে দিচ্ছি, পুলিসেও খবর দিচ্ছি।

টেলিফোনে ডাকাতির খবর শুনেই ইন্সপেক্টর শ্যামনাথ কন্সস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে এলেন। রাত আটটার সময় সহরের বুকে এইরকম ডাকাতি বড় একটা হয়না, পুলিসও অবাক হয়ে গেল।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ নিয়ে ইন্সপেক্টর শ্যামনাথ বাড়ীটা ভাল করে অনুসন্ধান করলেন, এমন একটা জিনিষও পাওয়া গেলনা যার সূত্র ধরে লোক দুটোকে খুঁজে বার করা পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়। সিঁড়ির দরজা বন্ধই ছিল, যাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে তারা ছাত থেকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু পাশের বাড়ীগুলোতে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরাই থাকেন, তাঁদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠেনা।

অনিতা ভয়ে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে সে বেশী কিছু বলতেই পারল না।

পুলিস ইন্সপেক্টর তাকে সাহস দিয়ে বললেন—এত ভয় পাবেন না, লোকগুলোকে ধরবার চেষ্টার কোন ক্রটী হবেনা আমাদের তরফ থেকে। বরং শান্ত হয়ে যদি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেন তাহলে খুবই ভাল হয়। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন—বলুন তো লোক দুটোকে দেখলে চিনতে পারবেন ?

—না, দুজনেরই মুখ কালো মুখোস দিয়ে ঢাকা ছিল—অনিতা বলে।

—তাদের জামাকাপড় সম্বন্ধে কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি ?

—একজন লম্বা কালো কোট পরেছিল, অন্য লোকটা পুরো হাতা জার্সি পরেছিল।

—এবার একটু মনে করে সব ঘটনাটা বলুন। লোক দুটোর মধ্যে এমন কিছু মনে পড়ছে যাতে তাদের চেনা সম্ভব হয় ?

—মুখের ওপর মুখোস ঢাকা থাকায় তাদের মুখ দেখতে পাইনি …তবে যে লোকটা আমায় ছোরা দেখিয়ে চাবি চেয়েছিল সে কালো রং এর পুরো হাতা জার্সি পরেছিল সেটার সামনে লাল রঙের ফুল এম্ব্রয়ডারী করা ছিল।

অপরাধীদের সম্বন্ধে এইটুকু জানতে পেরেই ইন্সপেক্টর একটু হাসলেন। তাঁর মনে পড়ল কদিন আগেই মেয়েদের সঙ্গে ফর্স্টিনর্স্টি করবার অভিযোগে বৈদ্যনাথ আর পুরন নামে স্কুলের দুজন ছেলেকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ইন্সপেক্টরের খুব ভাল রকম মনে ছিল যে সেদিনও বৈদ্যনাথ ছোকরা কালো জার্সি পরেছিল সেটার সামনে লাল ফুল তোলা ছিল !

পুরন নিজের বুড়ী ঠাকুমার সঙ্গে ঐ পাড়াতেই একটা বাড়ীতে থাকত। পুলিস পুরনকে জেরা করবার জন্যে থানায় নিয়ে গেল। পুরন থানায় গেলে তার ঠাকুমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্য দুজন কন্সটেবল লুকিয়ে রইল সেখানে।

পুরনকে থানায় নিয়ে যাবার পর সেই রাত্রেই বুড়ী নিজের এক আত্মীয়ের বাড়ী গেল। দোরের কড়া নাড়তে একজন এসে দরজা খুলে দিল। বুড়ীকে দেখেই আশ্চর্য হয়ে বলল—খুড়ী, তুমি এত রাত্রে··· কি ব্যাপার ?

—পুরনকে ডাকাতির সন্দেহে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। ওকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে।

—ডাকাতিতে কি পুরনের হাত ছিল ? লোকটা একটু দমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—কি আর বলব তোমায়। আজ দুপুরবেলা পুরন আর বৈদ্যনাথ একটা পুরোনো ছাতার কাপড় দিয়ে মুখোস তৈরি করছিল। ওদের দুজনের কত ভাব সে তো তুমি জান। পুরন হয়ত বৈদ্যনাথের পাল্লায় পড়ে ঐসব করেছে···

—আচ্ছা খুড়ী এখন তুমি বাড়ী যাও। যা করবার সকালেই করা যাবে।

বৃদ্ধা ঘরে ফিরে গেল। কনস্টেবল দুজন লুকিয়ে তার সব কথাই শুনতে পেয়েছিল।

পুলিস ইন্সপেক্টর পুরনের ঠাকুমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন—মা, যদি পুরনকে বাঁচাতে চান তবে তাকে আপনি বুঝিয়ে বলুন সে তার দোষ কবুল করুক।

বুদ্ধি বিবেচনার জোরে পুলিসের কার্যোদ্ধার হল। পুরনকে তার বুড়ী ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল। আর কোন উপায় না দেখে সে নিজের অপরাধ স্বীকার করল, এটাও জানাল যে চুরির সমস্ত গয়না তার বন্ধু বৈদ্যনাথের কাছে আছে।

পুলিস তখনই বৈদ্যনাথকে গ্রেপ্তার করল। সে যখন জানতে পারল যে পুরন সব কথাই পুলিসকে ফাঁস করে দিয়েছে তখন সেও নিরুপায়

হয়ে সব কথা বলে অপরাধ স্বীকার করল। বৈদ্যনাথের ঘর সার্চ করে চুরির গয়নাগুলো সবই পাওয়া গেল।

অপরাধী ধরা পড়লেও ইন্সপেক্টরের কৌতূহল সমাপ্ত হলনা। তাঁর মনে কেবল এই প্রশ্ন বার বার এল—আঠারো কুড়ি বছরের যুবক—এমন অপরাধ করল কেন? তিনি শেষে বৈদ্যনাথকে বেশ মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলেন।

—তোমরা ডাকাতি করতে গেলে কেন?

—ছোটবেলা থেকেই সিনেমায় ডিটেকটিভ বই, মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি দেখবার আমার খুব ঝোঁক। চারদিন আগে 'তীরন্দাজ' নামে এই রকম একটা সিনেমা আমরা দেখেছিলাম। সিনেমার নায়কের অভিনয় দেখেই আমাদের ডাকাতি করবার প্ল্যানটা করেছিলাম। বৈদ্যনাথের উত্তর শুনে তার মানসিক অবস্থা বোধগম্য হল।

আদালতে তাদের এক বছরের করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

খুনীর দল

পাঞ্জাবের একটি গ্রাম খরৌঁটা—রেল লাইনের ধারেই।

নাঙ্গল থেকে আম্বালাগামী সব ট্রেনই এই লাইন দিয়ে যায়। কিরতপুর ও রোপড় এই দুটি রেল স্টেশনের মধ্যে এই গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই প্রায় কৃষক। ভোর হতেই গ্রামের লোক নিজের নিজের গরু লাঙ্গল নিয়ে বেরিয়ে যায়, তারপর সারাদিন ক্ষেতেই কাজকর্ম করে।

সেদিন ভোরে দিলীপ সিং যখন নিজের ঘর থেকে বার হল তখনও ভাল করে ফরসা হয়নি। দ্রুত পাযে সে নিজের ক্ষেতের দিকে চলেছে হঠাৎ তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল, সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে দেখতে পেল লাইনের ধারে এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে। দেখেই দিলীপ সিং কাল বিলম্ব না করে গ্রামের পথে ফিরে এল।

অর্জুন সিংকে দেখতে পেয়েই সে চিৎকার করে বলল—জমাদার সাহেব, খুন!

অর্জুন সিং অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে খুন হল?

—রেল লাইনের ধারে এক অচেনা লোকের লাশ পড়ে আছে—দিলীপ সিং বলল।

অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক অর্জুন সিং গ্রামেই থাকে। সে তখনই গ্রামের আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রেল লাইনের ধারে গেল। দূর থেকেই লাশ দেখা গেল। অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এক যুবার মৃতদেহ পড়ে আছে, এত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে যে দেখে হৃৎকম্প হয়। অনেকগুলো গভীর আঘাতের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে।

দাঁড়িয়ে লোকেরা উচিৎ কর্তব্য আলোচনা করছে এমন সময় এক শিশুর কান্না শোনা গেল। শুনে অর্জুন সিং আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। একটু দূরেই লাইনের ধারে বছর খানেকের

একটি শিশুকে খুব কাঁদতে দেখা গেল। শিশুটির গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তাকে কোলে তুলে নিতেই সে চুপ করল।

সকলেই বলল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর রেলের পুলিসকে অবিলম্বে জানানো দরকার। একজন তখনই ভরতগড় রেল স্টেশনে গেল, সেইখান থেকে অবিলম্বে অন্য স্টেশনে এবং রেল পুলিসে খবরটা দেওয়া হল।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আম্বালার রেল পুলিস ইন্সপেক্টর শ্রীসিং ঘটনাস্থলে রওনা হলেন। খরেঁটা পৌঁছে প্রথমেই তিনি লাইনের দুধার দিয়ে দেখতে দেখতে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। আধমাইলটা'ক দূরে এক যুবতীর রক্তাক্ত শব লাইনের ধারে দেখতে পাওয়া গেল। গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে ইন্সপেক্টর আরও কিছু দূর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে গেলেন। এবার একটা খোলা স্যুটকেস ও একটা হোল্ডঅল পাওয়া গেল।

দুটি শব খুব ভাল করে দেখার পর ইন্সপেক্টর বুঝলেন এদের দুজনকেই হত্যা করা হয়েছে, তাদের শরীরের সর্বত্র এবং হাতে গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখে অনুমান করলেন তীক্ষ্ণ ধারাল ছোরার আঘাতের দাগ। শব দুটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে ইন্সপেক্টর এই নৃশংশ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পুলিসের বড় অফিসারের কাছে পাঠালেন। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে অবিলম্বে ডি এস. পি. তদন্তের জন্য খরেঁটা রওনা হলেন।

এখন সবচেয়ে জটিল সমস্যা হল মৃতদেহগুলি সনাক্ত করা। লাইনের ধারে পাওয়া স্যুটকেশ খুঁজে একটা খাম পাওয়া গেল, ঠিকানা লেখা ছিল—

শ্রীরাম সিং
বাঙ্গালী টোলা
আম্বালা

এই সূত্র ধরে একজন অফিসার আম্বালা গেলেন। রাম সিং-এর সঙ্গে দেখা করে খামটি দেখিয়ে অফিসার জানতে চাইলেন এ চিঠির সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না।

রাম সিং খামের চিঠি বার করে দেখেই বললেন—আরে এ তো সুরেন্দ্র সিং এর চিঠি, এ চিঠি কেমন করে পেলেন আপনি ?

তাঁর বিচলিত কণ্ঠস্বর শুনে অফিসার বললেন—ধীর হয়ে বসুন, আপনাকে সবই জানাচ্ছি। আচ্ছা, আপনি কি সুরেন্দ্র সিংকে জানেন ?

—সে যে আমার মেয়ে গুরবচনের স্বামী। রাম সিং বলেন।

—এরা কি কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন ?

—সুরেন্দ্র সিং দিল্লীতে চাকরী করে। বিয়ের পাঁচ বছর পর গত বছর তার একটি ছেলে হয়েছে। গুরবচন আনন্দপুর সাহিবে মানৎ করেছিল ছেলের জন্য……আজ কালের মধ্যেই তাদের গুরুদ্বার দর্শন করতে আনন্দপুর সাহিব যাবার কথা……। কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ?—রাম সিং উৎকণ্ঠিত স্বরে পুলিস অফিসারকে প্রশ্ন করলেন।

অফিসার এবার নীরব হয়ে গেলেন।

—আপনি চুপ করে আছেন কেন ? ভীত কণ্ঠে রাম সিং বলেন।

—আপনাকে একটা খুবই দুঃখের সংবাদ দিতে এসেছি।

—কি ?

—মনে হচ্ছে আপনার মেয়ে জামাই দুজনেই খুন হয়েছেন। তাঁদের মৃতদেহ রেল লাইনের ধারে পাওয়া গেছে।

রাম সিং-এর মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল……কাঁদতে কাঁদতে বললেন—কোথায় তাদের মৃতদেহ ?

—আমার সঙ্গে চলুন, রোপড়ে আছে তাদের শব।

মেয়ে জামাই-এর শব দেখে রাম সিং আর্তনাদ করে উঠলেন। তাকে শান্ত করা কঠিন হল।

শব দুটি সনাক্ত হল কিন্তু আর কোন কিছু জানা গেলনা অপরাধী সম্বন্ধে। কেবল এইটুকু জানা গেল যে তাদের আনন্দপুর সাহিব যাবার কথা ছিল। এই তথ্যের সূত্রে আনন্দপুর সাহিব গুরুদ্বারে যাওয়া দরকার।

আনন্দপুর সাহিব গুরুদ্বারের রেজিষ্টার দেখে নিশ্চিত জানা গেল যে সুরেন্দ্র সিং সপরিবারে দুদিন ঐখানে ছিল। ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যদি কিছু হদিশ পাওয়া যায় এই ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন—সুরেন্দ্র সিং যাবার সময় কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি কিছু আপনাকে জানিয়েছিল ?

—হ্যাঁ, আম্বালা যাবে বলেছিল।

—যাবার সময় এখান থেকে কোন লোক কি তার সঙ্গে স্টেশনে গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ, তার মাল নিয়ে স্বরণ সিং স্টেশনে গিয়েছিল।

স্বরণ সিংকে ডেকে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—আম্বালা যাবার সময় সুরেন্দ্র সিং কোন ট্রেনে চড়েছিল ?

—আম্বালার রাত্রের ট্রেনে আমি তাকে চড়িয়ে দিয়েছিলাম। স্বরণ সিং অফিসারকে বিস্তারিতভাবে বলল—ট্রেনের এঞ্জিনের কাছে একটা মেয়েদের কামরা একেবারে খালি ছিল। সুরেন্দ্র সিং স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে ঐ কামরায় উঠেছিল। ট্রেন যখন ছাড়ছে তখন নিহঙ্গ শিখ বেশধারী চারজন ঐ কামরায় চড়েছিল। (নিহঙ্গ শিখ নীল উর্দি পরা শিখ, গোঁড়া শিখ, যাঁদের লক্ষ্য হল শিখ ধর্মকে রক্ষা করা)

পাঞ্জাবের অনেকগুলি গুরুদ্বারে পুলিস অপরাধীদের খোঁজ খবর নিতে সুরু করল। বিভিন্ন গুরুদ্বারে থেকেছে, এমন বহু লোকের সম্বন্ধে প্রায় দু বছর ধরে অনুসন্ধান করতে লাগল। শেষে জানতে পারা গেল যে গুরুদ্বার শহীদী বাগে চারজনের একটি দল কিছুদিন ছিল। গুরুদ্বারের ম্যানেজার পুলিসকে জানালেন যে ঐ চারজন কিছুদিন গুরুদ্বার শহীদী বাগে থাকার পর হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে গুরুদ্বার ছেড়ে চলে যায়।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—ঐ চারজনের মধ্যে কারও নাম ঠিকানা ইত্যাদি বলতে পারেন ?

—হাঁ, তাদের মধ্যে দুজনের নাম আর ঠিকানা আমি নোট করেছিলাম··· নিজের পুরানো ডায়রী থেকে ম্যানেজার দুজনের নাম ও ঠিকানা পুলিসকে দিলেন।

ডিটেকটিভ পুলিসের দপ্তরে তাদের দুজনেরই সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে রেকর্ড ছিল। অবশেষে অজিত সিং, ঈশ্বর সিং, প্রেম সিং ও তেজা সিং এই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হল। সার্চ করে তাদের কাছে সুরেন্দ্র সিংএর ঘড়ি ও অন্য কিছু জিনিষ পাওয়া গেল। তাদের কৃপাণেও রক্তের দাগ ছিল।

এই চারজন অপরাধীর মধ্যে পনের বছর বয়সের তেজা সিং ছিল সবচেয়ে ছোট। সে নিজের স্বীকারোক্তিতে পুলিসকে জানাল যে আনন্দপুর সাহিব থেকে তারা চারজন রাত্রের ট্রেনে গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় ঐ কামরায় চড়েছিল যাতে সুরেন্দ্র সিং সপরিবার বসেছিল। সুরেন্দ্র সিং ও তার স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়তে ধারাল কৃপাণ দিয়ে তাদের খুন করা হয়। মৃতদেহ দুটো এবং এক বছরের ঘুমন্ত শিশুকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়।

তেজা সিং সরকারী সাক্ষী হয়ে গেল। পুলিসের প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য প্রমাণের সাহায্যে আদালতে অজিত সিং ও ঈশ্বর সিং এর ফাঁসি হয়, প্রেম সিংএর আজীবন কারাদণ্ড হয়। সুপ্রীম কোর্টে আপীলেও তাদের সাজা বহাল থাকে।

অবোধ বালক বলিদান

ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা গোন্দপাদার নামে ছোট গ্রামটি উড়িষ্যার কলহন্দী জেলায় অবস্থিত। এই গ্রামের আদিবাসীরা এখনও জাদু টোনা, তুকতাক ইত্যাদি কুসংস্কার আঁকড়ে আছে। আদিবাসীদের জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় চাষবাস ও শিকার। প্রকৃতির কোলে লালিত এই অন্ধবিশ্বাসী আদিবাসীরা নানান দেবদেবীকে নানাভাবে প্রসন্ন রাখবার চেষ্টা করে।

একদিন হঠাৎ দেখা গেল মকরু মাঝির তিন বছরের ছেলে তোতা নিরুদ্দেশ। এ খবর ছড়াতেই সারা গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গেল। যথা রীতি সেদিনও তোতাকে গ্রামে অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে ছেড়ে মকরু ও দ্রৌপদী ক্ষেতে কাজ করতে যায়। দুপুরবেলা যখন তারা ঘরে ফিরল তোতাকে পাওয়া গেলনা। তিনদিন ধরে মকরু ও দ্রৌপদী পাগলের মত তাদের একমাত্র ছেলেকে গ্রামে, জঙ্গলে, পাহাড়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল কিন্তু তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেলনা।

ছেলে হারিয়ে কাতর দ্রৌপদী অন্য উপায় না দেখে মছিন্দরের কাছে গেল। গ্রামের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস মছিন্দরের ওপর, সে নাকি ভূতপ্রেত-সিদ্ধ এবং পূজো তুকতাকের দ্বারা দেবদেবীদের প্রসন্ন করে বিপদ আপদ দূর করতে পারে। কোনও আদিবাসী পরিবারের বিপদ আপদ হলে তারা মছিন্দরের কাছে যায় এবং পূজোপাঠ করে দেবতার রোষ দূর করার জন্য তাকেই প্রার্থনা জানাতে বলে।

মছিন্দরের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে দ্রৌপদী মেজের উপর মাথা ঠোকে, কেঁদে বলে—তোতা হারিয়ে গেছে, মহারাজ।

—কবে হারিয়ে গেছে? মছিন্দর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করে।

—তিনদিন ধরে তার খোঁজ করছি—কোথাও পেলাম না। দ্রৌপদী কাতর হয়ে বলতে থাকে।

—'হুঁ' বলে মছিন্দর চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন হয়, থেমে থেমে অস্পষ্টভাবে মন্ত্র পড়তে থাকে, দ্রৌপদী সে মন্ত্রের এক বর্ণও বুঝতে পারে না।

আধঘণ্টা পরে মছিন্দরের চোখ খোলে, বেশ ভারি গলায় বলে—দেবী উষা বেলান তোর ওপর কুপিত হয়েছেন। দেবীকে প্রসন্ন করবার জন্য তোরা পূজো পাঠ কিছুই করিসনি।

ভয়াতুর দ্রৌপদী বলে—তাহলে কি হবে মহারাজ ?

—তোতার রক্তে দেবী তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তাকে আর তুই পাবি না। মছিন্দর দ্রৌপদীকে বোঝায়—ঘরের আর কারও ওপর যাতে বিপদ না আসে তারজন্যে তাদের পূজো আর্চা করতে হবে। আমি আজ রাতে দেবীর কোপ শান্ত করার জন্যে একমনে পূজো করব।

গ্রামের লোকেরা মছিন্দরের কথায় সায় দেয়। তারা মকরু ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেয়—তোতাকে ভুলে যাওয়াই ভাল।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। বরিঙ্গ পদাদের দু'তিন জন আদিবাসী হরিণ শিকার করতে করতে সুদান ডাঙ্গরে গিয়ে পড়ল। গোন্দপাদার থেকে মাইল খানেক দূরে এই ঘন জঙ্গল। শিকারীরা একটা গর্তের মধ্যে কিছু পড়ে আছে দেখতে পেল। দূর থেকে বাঁদরের মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে তারা খুবই আশ্চর্য হল। গর্তটায় তিন চার বছর বয়সের একটি ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। সন্ধ্যায় সেই মৃতদেহ নিয়ে শিকারীরা যখন গোন্দপাদার এল তখন সেখানে ভিড় জমে গেল। ছেলে তোতার মৃতদেহ দেখে মকরু ও দ্রৌপদীর হাহাকারে সারা গ্রামের আকাশ বাতাস ভরে গেল।

আদিবাসীদের প্রথা মত সারা রাত মৃতদেহ গ্রামেই রাখা হল।

গ্রামবাসীরা রাত্রে পালা করে মৃতদেহ পাহারা দেয়। মাঝরাতে যখন লক্ষণ বলে একটা লোক পাহারা দিচ্ছিল সে দেখে ঘরটার মধ্যে এক ধারে ঘুমন্ত একটা লোক কি যেন বলছে। লক্ষ্মণ কাছে গিয়ে দেখে মছিন্দর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলছে—দেবী রুষ্ট হয়েছেন, এবার আর আমার রক্ষা নেই, আমি ধরা পড়ে যাব……

ভোর হতেই মকরু নারলা থানায় হাজির হল। ছেলেকে নৃশংস ভাবে খুন করার রিপোর্ট লেখাবার পর পুলিস ইন্সপেক্টরকে তার সঙ্গেই গ্রামে আসতে অনুরোধ করল। ইন্সপেক্টরও তখনই মকরুর সঙ্গে গ্রামে এলেন।

বালকের শব পরীক্ষা করে অফিসার দেখলেন যে গলা ও পেট ধারাল অস্ত্র দিয়ে চিরে তাকে খুন করা হয়েছে। শিশুটির কপালে সিঁদুর ছিল, চুলের মধ্যে বালি মাখা চাল আটকে ছিল। পুলিস অবিলম্বে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিল।

ইন্সপেক্টর গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করলেন কিন্তু কারও কাছ থেকে অবোধ শিশু তোতার এই নৃশংস হত্যা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া গেলনা। অফিসার বুঝলেন আদিবাসী-সুলভ অন্ধ বিশ্বাসের বসে তারা মুখ বন্ধ করে রেখেছে। শেষে একটি আট বছরের ছেলে উরলুকে একান্তে ডেকে নিয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—তোতাকে তুমি কোথাও যেতে দেখেছিলে ?

একটু ভীত ভাবে উরুলু বলে—হ্যাঁ, সাত আট দিন আগে আমি তোতাকে গ্রামের বাইরে যেতে দেখেছিলাম।

—কোথায় ?

—সেদিন সকালে আমিও গ্রামের বাইরে ছাগল চরাতে যাচ্ছিলাম সেই সময় লালদেই-এর সঙ্গে তোতাকে নালার দিকে যেতে দেখেছিলাম।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—লালদেই কে ?

—মছিন্দরের বৌ-এর নাম লালদেই—।

তখনই ইন্সপেক্টর লালদেইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু কোন ফল হলনা। লালদেই বলল যে সে তোতার কথা কিছুই জানেনা।

মছিন্দরকে জিজ্ঞাসা করতে তার ঘরে পৌছে ইন্সপেক্টর দেখেন সে চোখ বুজে মন্ত্র জপ করছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মছিন্দর চোখ খুলতে ইন্সপেক্টর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কার ধ্যানে এতক্ষণ চোখ বুজে বসে আছ?

—মিলী দেবতাকে তুমি জান না? মছিন্দরের রক্তচক্ষু যেন পুলিস অফিসারকে ভস্ম করে দেবে মনে হল।

—না, ইন্সপেক্টর নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

—মিলী দেবতা সর্বশক্তিমান। এক পলে তিনি সমস্ত বিনাশ করতে পারেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে দেরী হয়না।

—হুঁ, ইন্সপেক্টর প্রসঙ্গ বদলে বললেন—তা তো বুঝলাম কিন্তু তোতার হত্যা রহস্যটা বুঝতে পারছি না।

—এতে রহস্য কি আছে? মকরু পরিবারের ওপর কুপিত হয়ে দেবী তোতার রক্তে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন—মছিন্দর দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

মছিন্দরের এইসব গোলমেলে কথায় অফিসারের সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। তাঁর অনুমান করতে দেরী হলনা যে তোতার হত্যায় নিশ্চয়ই মছিন্দরের হাত আছে। উরলুর উক্তির কথা মনে পড়ল—লালদেই-এর সঙ্গে সে তোতাকে গ্রামের বাইরে যেতে দেখেছিল—এ কথা কখনই মিথ্যা নয়।

মছিন্দরের ঘর সার্চ করা হল। ঘরে রক্তমাখা দুখানা ছুরি, একটা লাউ এর খোলার পাত্র, তালপাতার দুটো গোছা যার ওপর ভূত প্রেতের মন্ত্র লেখা ছিল এইসব পাওয়া গেল। লাউ এর খোলার পাত্রটায় সিঁদুর ও বালি মাখান চাল ছিল। তোতার চুলে আটকে থাকা চালগুলো ঠিক একই রকম।

মছিন্দর ও তার স্ত্রী লালদেইকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হল। ধরা পড়ে আর কোনও উপায় না দেখে মছিন্দর তোতাকে হত্যা করার অপরাধ স্বীকার করল। নিজের স্বীকারোক্তিতে মছিন্দর ইন্সপেক্টরকে জানাল যে মিলী দেবতার পূজায় সিদ্ধি লাভের জন্য সে তোতাকে বলি দিয়েছে।

মছিন্দর ও লালদেই-এর বিরুদ্ধে অবোধ শিশু হত্যা অপরাধের অভিযোগে মামলা হল। মছিন্দর পরে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে কিন্তু পুলিসের তথ্য ও প্রমাণ তার সাজা পাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আদালতের বিচারে মছিন্দরের আজীবন কারাদণ্ড এবং লালদেই-এর পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

চামড়ার ব্যাগ চুরি

মোতিহারির পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘুম থেকে তখনও ওঠেননি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে ঘরে এসে রিসিভার তুললেন—হ্যালো পাণ্ডে বলছি।

—আমি প্রসাদ! বেশ ঘাবড়ে গেছেন প্রসাদ, গলার স্বরেই বোঝা গেল।

—কে, জজ সাহেব?

—হ্যাঁ, মাপ করবেন, এত ভোরে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। জজ সাহেবের কণ্ঠস্বর খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

—কেন? কি হয়েছে?

—আমি এখানে এসেই মহা বিপদে পড়ে গেছি। মেয়েদের বিয়ের গয়না, নগদ টাকা জোগাড় করেছিলাম সব লোপাট হয়ে গেছে।

—অ্যাঁ, বলেন কি? কি করে? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—কি আর বলি আপনাকে! যে ব্যাগে গয়না, নগদ টাকা ছিল সেটা রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। গয়না টাকা মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মত হবে—জজ সায়েবের বেদনায় রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এখনই আসছি। রিসিভার রাখলেন পুলিস সুপার।

একটু পরেই পাণ্ডে তাঁর কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে জজ সায়েবের বাংলোয় উপস্থিত হলেন।

জজের বাড়ীতে এত বড় চুরির খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হলনা। সকালেই জেলার সাব অফিসার এবং গণ্যমান্য লোকেরা জজ সায়েবের বাংলোয় এসে হাজির হলেন। শ্রী প্রসাদ দু তিন দিন আগেই মোতিহারীতে

চার্জ নিয়েছেন, তাঁর সমস্ত আসবাব ও মালপত্র তখনও আগোছাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

ঘটনাস্থল ভাল করে দেখে এমন কিছুই পুলিস খুঁজে পেলনা যাতে অপরাধীর সম্বন্ধে কিছু অনুমানও করা সম্ভব হয়। আশ্চর্যের কথা যে ঐ ব্যাগটি ছাড়া আর একটি জিনিষও চোর স্পর্শ করেনি। রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছে, ফলে . অপরাধীর পায়ের ছাপও পুলিস পেলনা। বাংলোর চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ক্ষেতের মধ্যে চুরি যাওয়া চামড়ার খালি ব্যাগটা পড়েছিল।

কোন সূত্রই খুঁজে না পেয়ে পুলিস সুপার জজ সায়েবকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, এই ব্যাপারে আপনার কি অনুমান ?

—আমি আর আপনাকে কি বলব বলুন, আমার নিজের বুদ্ধি তো কোন কাজই করছেনা। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে যে, চোর চামড়ার ব্যাগটা ছাড়া আর কিছুতে হাত পর্যন্ত দেয়নি। এই ঘরের মধ্যে সবাই ঘুমিয়েছিলাম অথচ কেউ একটা শব্দও শুনতে পেলাম না।

—আচ্ছা, এবার দয়া করে স্থির হয়ে বেশ ভাল করে ভেবে আমায় সমস্ত ব্যাপারটা বলুন, যাতে আমি কিছু অনুমান করতে পারি। ব্যাগটা কোথায় রাখা ছিল ?—পুলিস সুপার জিজ্ঞাসা করলেন।

—এই ঘরেই টেবিলের ওপর ব্যাগটা রাখা ছিল, জজ সায়েবের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।—বদলি হয়ে আসবার সময় সমস্ত মাল ট্রাকে পাঠাবার সময় আমি নগদ টাকা আর গয়না একত্র করে নিজের সঙ্গে রাখাই উচিত মনে করেছিলাম।

—ঐ একটা ব্যাগেই গয়না, টাকা সব ছিল ? বিস্মিত পুলিস সুপার জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ,…আসলে আমার দুই মেয়ের বিয়ের জন্য নগদ বিশ হাজার টাকা রেখেছিলাম আর দশ হাজার টাকার গয়না গড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বদলি হওয়ায় বিয়ে স্থগিত রাখতে হল।

—তারপর ?

—ভেবেছিলাম এক মাসের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে দিতে পারব তাই গয়না, নগদ টাকা সবই নিজের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম।

—হুঁ, পুলিস সুপার কি একটা ভাবতে ভাবতে আবার প্রশ্ন করলেন, ঐ ব্যাগটার কথা আর কে কে জানত ?

—আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ঐ ব্যাগটার সম্বন্ধে কিছুই জানত না। এখানে এসে দুদিন ধরে আমরা সকলে গোছগাছ করতেই ব্যস্ত ছিলাম। ক্লান্ত হয়ে পড়ায় কাল সব দরজা বন্ধ করে কেবল এই ঘরের দরজাটা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরে উঠে আমার স্ত্রী দেখলেন ব্যাগটা নেই।

ঘটনাস্থল অনুসন্ধান করে বা জজ সায়েবের বিবরণে এমন কিছুই জানা গেলনা যাতে কিছু সুরাহা হয়। বাড়ীর চাকরদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন ফল হল না।

তিন চার দিন পর্যন্ত যখন চুরির কোন সুরাহাই হলনা তখন পুলিস মোতিহারী ও কাছাকাছি গ্রামগুলোতে গুণ্ডা, বদমাইসদের একটা লম্বা লিষ্ট তৈরী করল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা ও তাদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখবার জন্য সর্বত্র সাদা পোশাকে পুলিস ঘোরাফেরা করতে লাগল।

দ্বিতীয় দিনেই সিসওয়া গ্রাম থেকে পুলিস কনষ্টেবল হেড অফিসে এসে পুলিস সুপারকে জানাল—হুজুর আমার সন্দেহ, জজ সায়েবের বাড়ীর চুরিতে ইসলাম মিঞার হাত আছে......

—ইসলাম মিঞা ? কোথাকার ইসলাম মিঞা ?—উৎসুকভাবে পুলিস সুপার প্রশ্ন করলেন।

—সিসওয়া গ্রামের ইসলাম মিঞা।

—কিন্তু তার ওপর সন্দেহ হল কেন তোমার ?

—হুজুর কাল সে একটা নতুন সাইকেল আর একটা পেট্রোম্যাক্স কিনে এনেছে, অথচ তার একটা পয়সা রোজকার নেই, কোথা থেকে সে

এত পয়সা খরচা করে ঐসব কিনতে পারে? আমার তো সন্দেহ হয়······

পুলিস সুপার চুপ করে কি ভাবছিলেন, একটু পরে বললেন—তা হতেও পারে, তোমার সন্দেহ হয়ত ঠিক, কিন্তু তাড়াতাড়ি করা চলবে না তাতে কাজ হবেনা। তুমি আবার এখনই সিসওয়া চলে যাও, খুব নজর রাখা দরকার ইসলাম মিঞার ওপর। ভাল করে যথা সময়ে অনুসন্ধানের পরই পুলিস কাজ সুরু করবে।

ডিটেকটিভ পুলিসের কাছে খবর পাওয়া গেল গত তিনচার দিন থেকে ইসলাম মিঞার চালচলন একেবারে বদলে গেছে। এ কথাও জানা গেছে যে সে গ্রামের দু এক জনের সঙ্গে জমি কেনবার কথাবার্তা চালাচ্ছে।

গ্রামে পুলিসের আনাগোনা দেখে হঠাৎ ইসলাম মিঞা কোথায় সরে পড়ল। ঘর সার্চ করে নতুন কেনা সাইকেল, পেট্রোম্যাক্স ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেলনা। ইসলাম মিঞার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হল—ইসলাম মিঞা কোথায়?

—ও তো কদিন হল বাইরে গেছে। গ্রামের অশিক্ষিত মহিলা ইসলামের স্ত্রী জানাল।

সাইকেল ও পেট্রোম্যাক্সের দি[illegible]রা করে পুলিস অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—তবে এসব কে কিনে এনেছে?

স্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে পুলিস অফিসার আবার বললেন—আমরা সব কথাই জানি, এখন সত্যি কথা বলাই মঙ্গল।

চুরি ধরা পড়ে গেছে দেখে ইসলাম মিঞার স্ত্রী ভয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল—মাফ করুন হুজুর, এ চুরি সেই করেছে······

—গয়না টাকা কোথায়? গম্ভীর স্বরে অফিসার জানতে চাইলেন।

টাকা সে পাশের ঘরের মেজেয় পুঁতে রেখেছে, কিন্তু গয়নাগুলো আর অন্য কোথাও রেখে এসেছে।

ইসলাম মিঞার স্ত্রীকে তখনই গ্রেপ্তার করা হল। ঘরের একটা কোনে

মাটি খুঁড়ে পাঁচ ফুট গভীরে কাঁচের জারের মধ্যে আঠারো হাজার টাকার নোট পাওয়া গেল।

ইসলাম মিঞা স্ত্রীর গ্রেপ্তার ও ঘর সার্চের ফলে পুলিসের হাতে টাকা ধরা পড়ে গেছে এই খবর পেয়ে লুকিয়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই গ্রামের মধ্যে সে ধরা পড়ল। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হল। সে একথাও পুলিসকে জানাল যে চামড়ার ব্যাগে এত টাকা গয়না ইত্যাদি রাখা আছে তা সে জানতো না।

পুলিসকে সঙ্গে করে নিয়ে সে গ্রামের প্রাচীন মন্দিরে গেল, ঐখানে সমস্ত গয়না সে পুঁতে রেখেছিল।

চুরির অভিযোগে আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা হল। অপরাধ স্বীকার করার জন্য তার কেবলমাত্র দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা জরিমানা হল। ইসলাম মিঞার স্ত্রীর কুড়ি দিনের জেল হল।

ছেলে চুরি ও খুন

মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। কলকাতার লালবাজারের সেণ্ট্রাল জেলের কয়েদীরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রাতের ডিউটির সেপাই জেলের গেটে এদিক থেকে ওদিকে নিয়মিত টহল দিয়ে চলেছে। রাত্রের শান্ত পরিবেশে হঠাৎ জেলের এক কুঠুরী থেকে এক কয়েদীর চিৎকার ও কান্নার শব্দ শুনে সেপাই বেশ চিন্তান্বিত হল। কুঠুরীর কাছে গিয়ে দেখল যে একজন কয়েদী কুঠুরীর মধ্যে খুব জোরে জোরে পায়চারি করছে।

সেপাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে—হল কি তোমার? এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

কয়েদী সেপাই-এর প্রশ্নের কোন উত্তর দিলনা; সে যেন কিছু শুনতেই পায়নি। আবার সেই চিৎকার আর কান্না আর পাগলের মত দ্রুতবেগে কুঠুরীর মধ্যে পায়চারির বিরাম নেই তার। সারা দেহ তার ঘর্মাক্ত, মুখ থেকে ফেনা বার হচ্ছে। দুটো চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে সে এইভাবে চিৎকার করে কেঁদে ও কুঠুরীর মধ্যে দ্রুতবেগে পায়চারি করে শেষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কয়েদীর নাম জয়ন্ত রায়চৌধুরী, একটি বারো বছরের ছেলেকে চুরি করে তাকে খুন করার অপরাধে সে গ্রেপ্তার হয়েছিল। যথারীতি তদন্তের পর পুলিস তার বিরুদ্ধে অপহরণ ও খুনের মামলা করে। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বালক অপহরণ ও হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তার ফাঁসির সাজা হয়েছে।

আদালতের রায় শুনে জয়ন্ত এমনভাবে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল যেন তার মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। আদালতেই বলে উঠেছিল—একমাত্র ফাঁসিই হল আমায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

চন্দ্র বসু কলকাতার কোন ফার্মে অনেক বছর ক্যাশিয়ার ছিলেন। রোজকার মত সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেও তিনি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেড়াতে বার হলেন। রাত্রি নটায় যখন বাড়ী ফিরলেন স্ত্রীকে দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি যেন একটা অঘটনের আভাস পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

ভীত কণ্ঠে স্ত্রী উত্তর দেন—পিণ্টুর কোন খবর নেই, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—কোথায় আর যাবে, নিশ্চয় কোন বন্ধুর বাড়ীতে আছে।

—না, আমি সমস্ত জায়গায় জিজ্ঞাসা করেছি কোথাও খবর পাইনি। মীনা বলছে সে সন্ধ্যাবেলা এক অচেনা ছেলের সঙ্গে পিণ্টুকে কথা বলতে দেখেছে। তারপর আর সে বাড়ী আসেনি, আর কেউ তাকে দেখেওনি। চিন্তায় ভয়ে দুঃখে পিণ্টুর মা কেঁদে বললেন—কে জানে আমার পিণ্টু কোথায় চলে গেছে, যেমন করে হোক ওকে খুঁজে আন……।

—দেখ এমন করে কাঁদলে তো কাজ হবে না। তুমি শান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বস আমি এখনই পুলিসে খবর দিচ্ছি। চন্দ্রবাবু স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন।

চন্দ্রবাবু অবিলম্বে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায় গিয়ে তাঁর বারো বছরের ছেলে পিণ্টুর নিরুদ্দেশের খবর দিয়ে ডায়েরী লেখালেন। পুলিস অবিলম্বে ছেলেটির অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু খবর পাওয়া গেলনা। চন্দ্রবাবু নিজেও জানাশোনা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলের বাড়ী বাড়ী খবর নিতে গেলেন, কিন্তু পিণ্টুর কোন খবর পেলেন না।

পরদিন দুপুর বেলা হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে তিনি বাড়ী ফিরে দেখেন দরজার পাশে একটা খাম পড়ে আছে। উৎসুক হয়ে তাড়াতাড়ি সেখানা তুলে নিলেন। খামের মধ্যে এই চিঠিখানা ছিল—

'আপনার ছেলে আমাদের কাছে নিরাপদে আছে। তারজন্য এখন চিন্তা করা বৃথা। আমাদের অবিলম্বে চার হাজার টাকার দরকার। এ টাকা আমরা আপনার কাছে ধার চাইছি এবং কথা দিচ্চি যে ঠিক এক মাস পরে সুদ সহ সমস্ত টাকাটা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আজ দুপুর বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আপনি দু হাজার টাকা নিয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটে নিউ সিনেমার গেটে একা অপেক্ষা করবেন। পাঁচ ও দশ টাকার নোটে সব টাকাটা একটা খামের মধ্যে রাখবেন। একশ টাকার নোট নেওয়া হবেনা। আমাদের লোক ঠিক সময়ে টাকা নেবার জন্য সিনেমার গেটে গিয়ে পৌঁছবে। তার হাতে একটা কালো রুমাল বাঁধা থাকবে। টাকা নিয়ে আমাদের লোক নিরাপদে ফিরলে তবেই আপনার ছেলেকে আপনি ফিরে পাবেন। বাকী দু হাজার টাকা কাল ঠিক একই সময়ে একই জায়গায় নিয়ে আসবেন।—কালমেঘ'

চিঠি পড়ে ছেলের নিরাপত্তার খবর পেয়ে চন্দ্রবাবু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন বটে কিন্তু চার হাজার টাকার অঙ্কটা ভেবে তাঁর মনটা দমে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনেক চিন্তা করলেন, কিন্তু ঠিক করতে পারলেন না কি করা কর্তব্য। এত অল্প সময়ে এত টাকা জোগাড় করে ওঠা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব অথচ টাকা না দিলে ছেলের প্রাণ বিপন্ন···কি করবেন ভেবেই পেলেন না।

বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। অবশেষে ঠিক করলেন পুলিসে খবর দেবেন। পরদিন সকালে তিনি পুলিসের এক বড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন। দুদিন আগে পিণ্টুর নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা এবং তারপর আর যা কিছু হয়েছে সব তাঁকে জানালেন। যে চিঠিতে চার হাজার টাকা দাবী করা হয়েছে সে চিঠিটাও দেখালেন। সব শুনে অফিসার তাঁকে ·বুঝিয়ে বললেন—আপনার সহযোগিতা পেলে নিশ্চয় কিছু করা যাবে। বাইরে থেকে দেখলে নোটের তাড়া আছে বলে মনে

হয় এইভাবে সাদা কাগজের একটা প্যাকেট বানিয়ে সেটাকে হাতে নিয়ে যথা সময়ে নিউ সিনেমার গেটে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমরা কাছাকাছিই থাকব। টাকা নেবার জন্য যখন কেউ আসবে আমাদের একটু ইশারা করে দেবেন, তারপর বাকী কাজ আমাদের।

ওদিকে বাড়ী পৌঁছেই চন্দ্রবাবু আর একটা চিঠি পেলেন, তাতে লেখা ছিল—'আমরা জানতে পেরেছি যে আপনি পুলিসে খবর দিয়েছেন, আমরা আপনাকে আবার সতর্ক করে দিচ্ছি যদি ঠিক সময়ে আমরা টাকা না পাই কিংবা আমাদের মধ্যে কোন লোক পুলিসে ধরা পড়ে তাহলে আমাদের নিরুপায় হয়ে পিন্টুকে হত্যা করতে হবে। নিউ সিনেমার গেটে সঙ্গে আর কাউকে আনবেন না। ছেলের প্রাণ বাঁচাতে হলে আমাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

—কালমেঘ'

যথা সময়ে নোটের তাড়া নিয়ে চন্দ্রবাবু ধর্মতলা স্ট্রীটের দিকে রওনা হলেন। ছেলের জন্য মনে নানারকম আশঙ্কা। দ্বিতীয় চিঠির খবরও তাঁর এক বন্ধু পুলিসকে দিয়েছেন।

অপরাধীকে ধরবার জন্য ধর্মতলা স্ট্রীটে পুলিস জাল পেতে তৈরী হয়ে বসেছিল। সাদা পোশাকে পুলিস চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। সিনেমার গেটে পৌঁছে দুরু দুরু বক্ষে চন্দ্রবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন। সময় যত এগিয়ে আসছে তাঁর বুকের স্পন্দন ততই দ্রুত হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পুলিস চন্দ্রবাবুর ওপর নজর রাখতে লাগল, ইশারা পাবামাত্র তারা অপরাধীকে ধরবে। ওদিকে চন্দ্রবাবু ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন হঠাৎ একসময় সামনে এক যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। সে তাঁকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে জিজ্ঞাসা করল—টাকা এনেছেন।

যুবকটির হাতে কালো রুমাল না থাকায় চন্দ্রববু কি করবেন,

ভাবছিলেন। তাঁকে ইতস্ততঃ করতে দেখে যুবকটি সরে পড়ার মতলবে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল। কিন্তু পুলিস অফিসার তাকে ধরে ফেললেন।

—তোমার নাম কি ?—অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

—ভাস্করচন্দ্র দে।

—অন্য সঙ্গীরা কোথায় ?

—আমি আর কাউকে জানিনা। জয়ন্ত টাকাটা নেবার জন্য আমায় পাঠিয়েছে। ভয়ে যুবকটির গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ভয় দেখিয়েও কোন ফল হল না। সে পিণ্টুর সম্বন্ধে কিছুই বলল না। বারবার বলল যে পিণ্টুর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপার বা তার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। কিন্তু ভাস্করের কাছ থেকে জয়ন্তর ঠিকানা পাওয়া গেল এবং জয়ন্তকে পুলিস কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করল। জয়ন্ত পুলিসকে বলল যে সে পিণ্টুর সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

পরদিন ভোর ছটার সময় কার্জন পার্কের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক কনস্টেবল বাঁদিকে একটা ঝোপের মধ্যে থেকে একটি পা দেখতে পেল। কাছে গিয়ে দেখে একটি ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। বালকটির গলা রুমাল দিয়ে ফাঁস বাঁধা, দেখেই সে বুঝতে পারল শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়েই পুলিস অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। ছেলেটির লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠান হল। দুদিন আগে নিরুদ্দিষ্ট পিণ্টুর লাশ বলেই পুলিস তা সনাক্ত করল। তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করা হয়েছে।

পিণ্টুর লাশ খুঁজে পাওয়ার পর পুলিস জয়ন্তের সম্বন্ধে খুব জোর তদন্ত শুরু করল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে জয়ন্ত প্রথমে অনেক রকম কথা বলেছিল কিন্তু যখন দেখল যে সমস্ত ইতিহাস পুলিস জানতে পেরেছে তখন তাকে সত্যি কথাই স্বীকার করতে হল। জয়ন্তের সম্বন্ধে জানা গেল যে খুব ছোটবেলায় তার বাবা মারা যায়। শিক্ষাদীক্ষা বা দেখাশোনার

অভাবে তার স্বভাব খারাপ হয়ে যায়, অসৎসঙ্গে মিশে মদ খেতে আরম্ভ করে সে। অর্থাভাবে ছোটখাট অপরাধও করতে থাকে। অবশেষে ভাইদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে হ্যারিসন রোডে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে।

তারপর নিজেকে কাঠের এক বড় ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়ে জয়ন্ত অনেক বড় বড় লোকের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করে। এইভাবে তার গুহর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। গুহর মেয়ে শ্রীলেখার সঙ্গে জয়ন্ত প্রেমে পড়ে এবং শ্রীলেখার জন্য নিত্য নতুন উপহার আনতে আরম্ভ করে। গুহর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সে শ্রীলেখার অসুখের অজুহাতে জয়ন্তর কাছ থেকে তিন হাজার টাকা চেয়েছিল। শ্রীলেখাকে বিয়ে করবার জন্য জয়ন্ত তখন পাগল। সে কি করবে ভেবে পেল না।

চন্দ্রবাবুর পরিবারের সঙ্গে জয়ন্তর অনেক দিনের পরিচয় ছিল। অনেক ভেবেচিন্তে সে টাকাটা জোগাড় করবার উদ্দেশ্যে তাঁর একমাত্র পুত্র পিণ্টুকে চুরি করার মতলব করে। এক বন্ধুর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যায় সে চন্দ্রবাবুদের পাড়ায় গিয়েছিল। জয়ন্ত ছেলেটিকে দিয়ে পিণ্টুকে ডাকতে পাঠিয়ে নিজে বাড়ীর নিচে অপেক্ষা করছিল। পিণ্টু কাছে আসতেই তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে একটা ট্যাক্সিতে করে খিদিরপুরে নিয়ে যায়। জয়ন্তর মতলব ছেলেদুটি কিছু বুঝতে পারেনি। সে প্রায় ঘণ্টাদুই ধরে তাদের নিয়ে গাড়ীতে ঘোরে, তার উদ্দেশ্য ছিল পিণ্টুকে কোন সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু এই রকম কোন জায়গা না পাওয়ায় তার মতলব ভেস্তে গেল। এইরকম মানসিক অবস্থায় সে খিদিরপুর থেকে শেয়ালদা যাবার জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে। অন্য ছেলেটির বাড়ী পথেই পড়ে, সে নিজের বাড়ীর কাছে নেবে যায়। জয়ন্ত আর পিণ্টু তখন ঘোড়ার গাড়ীতে একা। জয়ন্ত আর কিছু করতে না পেয়ে পিণ্টুকে খুন করবে ঠিক করল। ভীষণ মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সে হঠাৎ দুহাতে পিণ্টুর গলা টিপে ধরে। এত দ্রুত এই কাজ করেছিল যে পিণ্টুর

গলা দিয়ে টুঁ শব্দটিও বার হয়নি। তার চোখ উল্টে যেতে দেখে জয়ন্ত পকেট থেকে রুমাল বার করে গলায় একটা ফাঁস বেঁধে দিল।

জয়ন্ত দেখল পিণ্টুর দেহে প্রাণ নেই। সে তখন একটা গলির সামনে গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে নিচে নেবে কোচম্যানকে বলল যে তার ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে কোলে করে নিয়ে যাবার জন্য চাকরকে ডাকবার অজুহাতে জয়ন্ত গলিপথে সরে পড়ল। অনেকক্ষণ তার অপেক্ষায় থেকে কোচম্যান নিজে পিণ্টুকে জাগাতে গিয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল। গলায় রুমাল দিয়ে ফাঁসি দেওয়া মৃত পিণ্টুকে নিয়ে সে তখন গাড়ীটা কার্জন পার্কের পাশে দাঁড় করিয়ে ঝোপের মধ্যে লাশ ফেলে পালিয়ে গেল।

টাকার দাবী করে 'কালমেঘ'-এর স্বাক্ষর করা যে দু খানা চিঠি পাঠানো হয়েছিল তা জয়ন্তর লেখা।

ঘোড়াগাড়ীর কোচম্যানকেও খুঁজে বার করা হল।

হাইকোর্টে খুনের অপরাধে জয়ন্তর ফাঁসির সাজা হল। আপিলেও জয়ন্তর সাজা বহাল থাকে।

ট্রেনের মধ্যে খুন

সেদিন যখন টু আপ পাঞ্জাব মেল ইটারসী ষ্টেশন ছাড়ল তখন রাত ঠিক দশটা। ছোট ছোট ষ্টেশন পার হয়ে রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে ট্রেন দ্রুত ছুটে চলেছে। অকস্মাৎ ট্রেনের বাঁশীর সুতীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। বিকট শব্দ করে ট্রেনটা একটা নির্জন জায়গায় থেমে গেল। হঠাৎ ব্রেকের প্রবল ঝাঁকুনিতে ট্রেনের যাত্রীদের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ট্রেন থামতেই রেলওয়ে পুলিসের কনস্টেবল, গার্ড, টি-টি সবাই নামলেন। দূর থেকে একটা কামরার দোর খোলা দেখে তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেলেন। একটা সেকেণ্ড ক্লাসের খোলা দরজার সামনে নিচে লাইনের পাথরের ওপর আহত ও রক্তাক্ত এক যাত্রী পড়ে ছটফট করছিল। জ্ঞানশূন্য যাত্রীর বুকে ও গলায় অনেকগুলো গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল, তখনও সেই ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে গার্ড ও কনস্টেবল কামরার মধ্যে গেলেন। একটা বিছানা এলোমেলো ছড়ান পড়েছিল এবং মেঝের ওপর ছিল একটা রক্তমাখা দা। সামনে পুলিসের একটা ইউনিফর্ম টাঙ্গানো ছিল। এই কামরা থেকেই বিপদ সঙ্কেত সূচক চেন টানা হয়েছিল। কামরাটার সঙ্গে পাশাপাশি লাগাও আর একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা ছিল। রেলওয়ে কনস্টেবল বাহাদুর সিং তাড়াতাড়ি সেই কামবায় যেতেই যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে আতঙ্কে তাঁর লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি চিৎকার করলেন—গার্ড সায়েব এখানেও খুন।

বাহাদুর সিংএর চিৎকার শুনে গার্ড ও টি-টি সেই কামরাটায এলেন। মেঝের ওপর এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। তার শরীবে অনেকগুলি আঘাতের চিহ্ন। তার বিছানা কাপড় চোপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কামরাটার চারধারে লোকের ভিড় জমে গেছে। অপরাধী

সম্বন্ধে নানান লোকের নানান অনুমান ও মত। অনেকের বিশ্বাস পাথরের উপর আহত অজ্ঞান লোকটিই অপরাধী, খুন করে পালাতে গিয়ে সম্ভবত ট্রেনের কামরা থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কনস্টেবল অন্য যাত্রীদের সাহায্যে অজ্ঞান আহত লোকটিকে কামরায় এনে শুইয়ে দিল। তার পকেটে কিছু কাগজ পত্রের সঙ্গে একটি পরিচয় পত্রও ছিল। আইডেন্‌টিটি কার্ডএর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে প্রমাণিত হল যে আহত ব্যক্তির নাম মনমোহন। সে ইটারসী রেলওয়ে পুলিসের সুবেদার। কামরায় টাঙ্গানো ইউনিফর্মটা তারই।

গার্ড ও কনস্টেবল সুবেদারকে বাঁচাবার জন্য কি করা যায় পরামর্শ করছিলেন। এমন সময় লাইনের ধারে ক্ষেতের মধ্যে 'ধর ধর' চিৎকার শোনা গেল। শুনেই কনস্টেবল সুবেদার সিং ক্ষেতের দিকে দৌড়ে গেল। তার সঙ্গে কিছু যাত্রীও গেল। কাছে গিয়ে বাহাদুর সিং দেখল কয়েকজন লোক একটা লোককে ধরে ফেলেছে এবং লোকটা ছাড়িয়ে পালাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বাহাদুর সিং বলল—এ লোকটা কে ?

—গাড়ী থেকে নেমে পালাচ্ছিল, এর কাপড়ে রক্তের দাগ রয়েছে—এক বৃদ্ধ গ্রামবাসী উত্তর দিলেন।

লোকটাকে গ্রেপ্তার করা হল। সার্চ করে তার কাছ থেকে এক গোছা নোট ও ইটারসী থেকে খাণ্ডোয়ার টিকিট পাওয়া গেল।

পরবর্তী ষ্টেশন থেকে খাণ্ডোয়ার ষ্টেশন মাষ্টারকে তার করে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের খবর দেওয়া হল। প্রায় দু ঘণ্টা পরে মাঝরাতে ট্রেন যখন খাণ্ডোয়া পৌঁছাল তখন ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপার, সিভিল সার্জন ও আরও কয়েকজন অফিসার প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন। দরকারী পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য ঐ কামরাটা ট্রেন থেকে কেটে রাখা হল। রেলওয়ে পুলিসের সুবেদারকে উদ্বেগ-জনক অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হল।

কামরায় প্রাপ্ত মৃত ব্যক্তির কাগজ পত্রের মধ্যে তার নাম ঠিকানা লিখিত

কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল। তা থেকে জানা গেল মৃত ব্যক্তির নাম যশবন্ত নাবর, সে বোম্বাইএর এক চামড়ার মিলের ম্যানেজার।

আসলে হত্যাকারী কে সেটা সাব্যস্ত করা পুলিসের পক্ষে বেশ কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নাবরকে সুবেদার মনমোহন হত্যা করেছে না ঐ অজ্ঞাত লোকটা, যে গাড়ী থেকে নেমে পালাচ্ছিল সে? ওদিকে সুবেদার মনমোহনের অবস্থা সঙ্কটজনক, তিনি অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন। তার কাছে কিছু জানবার আশা উপস্থিত নেই। সুতরাং রহস্য উদ্‌ঘাটনের একমাত্র পথ ঐ অজ্ঞাত লোকটিকে জেরা করা।

অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

—গুলাব সিং।

—কোথায় থাক?

—হোসঙ্গাবাদ জেলার বেদী গ্রামে।

—তোমার কাপড়ে রক্তের দাগ কোত্থেকে এল আর তোমার হাত এত কেটে গেল কি করে? প্রশ্ন শুনে গুলাব সিং একটু চুপ করে থেকে বেশ গরম মেজাজেই বলল—খুনীকে আটকাতে গিয়ে নিজে এইভাবে জখম হয়েছি।

পুলিস অফিসার তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—একজন নিরীহ লোককে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন এভাবে বিপন্ন করে সত্যিই তুমি খুবই প্রশংসার কাজ করেছ। তবু যতক্ষণ না এই খুনের তদন্ত শেষ হয় ততক্ষণ তোমায় আটক থাকতে হবে।

অফিসারের সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তার প্রভাব দেখা গেল। গুলাব সিং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করবার জন্য বলল—আমি ইটারসী থেকে এই কামরায় চড়েছিলাম। কামরায় দুজন যাত্রী ছিল। আমি তখন সবেমাত্র শুয়েছি এমন সময় 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শুনতে পেলাম। উঠে দেখি একজন যাত্রী অন্য আর একজনের বুকের ওপর বসে তাকে ছোরা মারছে। আমি লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, সেই সময় আমার হাতে আঘাত

লেগেছিল। একটু পরেই ঐ যাত্রীর চিৎকার থেমে গেল। আর তার লাশ বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে মেঝের ওপর পড়ল। গাড়ীর চেনটা টেনেই আমি ভয়ে পালিয়ে গেলাম।

গুলাব সিং এর কথা সত্য বলে যদি ধরেও নেওয়া যায় তবু সুবেদার মনমোহন সিং এর এত চোট লাগল কি করে বা সে ট্রেনের বাইরে গিয়ে পড়ল কি করে? এর উত্তর সুবেদার মনমোহনই দিতে পারে কিন্তু তিন দিন ধরে তার জ্ঞানই ফেরেনি। চতুর্থ দিনে সুবেদার মনমোহনের সামান্য জ্ঞান হল, সে চোখ খুলল কিন্তু তখনও তার কাউকে চেনবার বা কিছু মনে করবার ক্ষমতা ছিল না।

যে কামরায় খুন হয়েছিল তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে কয়েকটি হাত ও পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। এরমধ্যে একটা ছাপ গুলাব সিং এর বাঁ হাতের ছাপের সঙ্গে মেলে। এরদ্বারা গুলাব সিং এর ঐ কামরায় থাকার প্রমাণ স্পষ্ট, অবশ্য তার কথামত নাবরকে রক্ষা করবার জন্যই যে সে হস্তক্ষেপ করেছে তা প্রমাণিত হয় না। ট্রেনের কামরায় যে দা-খানা পাওয়া গিয়েছিল সেটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ওপরে গুলাব সিং এর আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে।

গুলাব সিং এর সম্বন্ধে বেদী গ্রামে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল বাজারে তার অনেক টাকা দেনা। তার এক প্রতিবেশী মুন্সীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে গুলাব সিংকে সে কিছুদিন আগে একটা দা-জাতীয় ছোরায় শান দিতে দেখেছিল। রেলের কামরায় পাওয়া দা-খানা দেখেই মুন্সী বলল—এটা তো গুলাব সিং এরই দা—এটাই তো সে সেদিন গুলাব সিংকে ধার করতে দেখেছিল।

ইতিমধ্যে হাসপাতালে সুবেদার মনমোহন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। পুরো দু'মাস পরে সিভিল সার্জন তাঁকে ভাল করে পরীক্ষা করে বিপদ মুক্ত বলে রায় দেবার পর তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করেও সিভিল সার্জন সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

পুলিস অফিসার হাসপাতালে পৌঁছালে সুবেদার একটু হেসে তাঁকে স্বাগত জানালেন। হত্যা সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—আমার তো পুনর্জন্ম হল বলা যায়। ট্রেনের ঘটনাটা মনে পড়লে আজও আমার হৃৎকম্প হয়।

—তা তো ঠিক, কিন্তু পুরো ঘটনাটা ঠিকমত না জানতে পারলে আমরা অপরাধীর বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাতে পারছি না! ...ঐ গাড়ীতে আপনি ছাড়া আর কোন যাত্রী তো ছিল না সুতরাং আপনিই ঠিক কথা বলতে পারবেন।

একটুখানি চুপ করে থেকে সুবেদার মনমোহন বলল—সেই গাড়ীতে প্রথমে আমরা কেবল দুজন যাত্রী ছিলাম। ইটারসী থেকে ট্রেন ছাড়বার সময়ে আর একজন গাড়ীতে চড়ল। ট্রেন ছাড়বার খানিকটা পরে চিৎকার শুনে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম যে লোকটা ইটারসী থেকে ট্রেনে চড়েছিল সে ঘুমন্ত যাত্রীকে দা দিয়ে কাটছে। আমি এক লাফে তাকে ধরে ফেলতে চেষ্টা করলাম। সে প্রথম যাত্রীকে ছেড়ে আমায় দা দিয়ে মারতে চেষ্টা করল। আর কোন উপায় না দেখে আমি চেন টানলাম। ট্রেন থামতেই লোকটা নিচে নেমে পালাতে গেল। তাকে ধরবার জন্যই আমি ট্রেন থেকে নিচে লাফিয়ে পড়লাম। এই সময় সম্ভবত পড়ে গিয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

সুবেদার মনমোহনের কাছ থেকে হত্যার পুরো রহস্য জানা গেল। গুলাব সিং এর কাছ থেকে পাওয়া নোটের গোছাও ছিল নাবরের, সে তার স্যুটকেস থেকে বার করে নিয়েছিল।

গুলাব সিং এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের হল। সুবেদার মনমোহনের বয়ান এবং অন্য প্রমাণাদির সাহায্যে পুলিস তার বিরুদ্ধে খুনের অপরাধ সাব্যস্ত করতে পেরেছিল। হাইকোর্টে গুলাব সিং এর ফাঁসির সাজা হয়।

ট্রাক থেকে পলায়নের রহস্য

মুষলধারে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পাণ্ডুয়া থানার ইন্সপেক্টরকে রাস্তার ওপরেই অপেক্ষা করতে হল। রাত দশটা বেজে গেছে। বৃষ্টি থামা তো দূরের কথা আরও বাড়তে লাগল অথচ তাঁর থানায় ফিরে যাওয়া দরকার। এই সব সাতপাঁচ ভাবছেন এমন সময় ইন্সপেক্টর একখানা পাণ্ডুয়াগামী ট্রাক দেখতে পেলেন। ট্রাক থামিয়ে তাতেই চেপে বসলেন ইন্সপেক্টর। রাতের ঘন অন্ধকারে ট্রাক এগিয়ে চলল।

সিমলাগড় কসবার কাছাকাছি যখন ট্রাকটা পৌঁছেচে তখন পথের ধারে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। বৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপে। সে হাত তুলে ইশারা করায় ট্রাক থামল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার?

ট্রাকে পুলিস অফিসারকে দেখে মনে হল সে যেন সাপের ছোবল খেয়েছে। ঘাবড়ে গিয়ে বলল—কিছু না, আমি ভেবেছিলাম ট্রাক খালি, তাই হাত দেখিয়ে থামিয়েছিলাম।

—তুমি যাবে কোথায়? ইন্সপেক্টর তাকে ভয় পেতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি গোলা বাড়ী যাব, কিন্তু আপনি ভাববেন না। আমি অন্য কোন গাড়ীতে চলে যাব। গলার স্বর শুনে মনে হল লোকটি বেশ ঘাবড়ে গেছে।

—না, না এরই পেছনে বসে পড়—ইন্সপেক্টর তাকে ট্রাকে উঠতে বললেন।

সে চড়ে বসতেই ট্রাক আবার চলতে সুরু করল। পথে যেতে যেতে ইন্সপেক্টরের মনে প্রশ্ন উঠল—এই দুর্যোগের রাত্রে লোকটা

চলেছে কোথায়? ভাবলেন পাণ্ডুয়ায় নেবে নিশ্চয় তাকে একথা জিজ্ঞাসা করবেন।

পাণ্ডুয়া থানায় ট্রাক থামতেই ইন্সপেক্টর পেছন দিকে চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য ব্যাপার। লোকটা ট্রাকে নেই। অনুমান করলেন পথে কোন মোড়ে ট্রাকের স্পীড কম হবার সময় সে হয়ত গাড়ী থেকে নেমে গেছে। তবুও মনে একটা খট্‌কা রইল লোকটা এভাবে চলতি গাড়ী থেকে চুপচাপ সরে পড়ল কেন? ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় বলেই তাঁর মনে হল। তিনি তখনই নিজের ডায়রীতে ঘটনাটা নোট করে রাখলেন।

পরদিন থানায় খবর এল সিমলাগড় রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটা পুকুরে এক যুবতী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। থানা থেকে কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে ইন্সপেক্টর অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। লাশ পুকুর থেকে তোলা হল। ভাল করে দেখে মনে হল তার বয়স পঁচিশের বেশী নয়। সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে কাঁচের চুড়ি দেখে বোঝা গেল মহিলাটি বিবাহিতা। বেশভূষা দেখে তাকে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের বউ বলেই মনে হল। তার শরীরে আঘাতের এমন কোন চিহ্ন ছিল না যাতে মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়।

সিমলাগড় স্টেশনে পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করায় এক দোকানদার অফিসারকে জানাল যে সে কাল সন্ধ্যাবেলায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির সঙ্গে ঐ যুবতীকে যেতে দেখেছিল। এ ছাড়া আর কিছুই দোকানদার বলতে পারল না।

লাশের ফটো নিয়ে সেটা ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হল। পরীক্ষায় জানা গেল বুকের ডানদিকে খুব জোরে আঘাত পাবার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। একথাও জানা গেল যে মৃত্যুর পরই লাশ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিসের সামনে প্রথম কঠিন সমস্যা—লাশ সনাক্ত করা। কাপড় জামা পরীক্ষা করে তার সাড়ীর আঁচলের কোণে এস. ৯৯২২ ধোবার নম্বর পাওয়া গেল। বোঝা গেল মহিলা কোন সহরে থাকত।

প্রায় দু বছর কেটে গেল। অনেক রকম খোঁজ নিয়েও পুলিস ঐ মৃত যুবতীর নাম ঠিকানা কিছুই জানতে পারল না। অন্য কোন সূত্র না পেয়ে পুলিস নিকটবর্তী জেলাগুলির থানার মারফৎ অনুসন্ধান শুরু করল। নিরুদ্দিষ্ট মহিলাদের পুরানো রেকর্ড দেখার পর গোলাবাড়ী থানায় দু বছর পূর্বে লেখানো একটা রিপোর্টের প্রতি পুলিস অফিসারের চোখ পড়ল। বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহিতা যুবতী পুষ্পরাণীর নিরুদ্দেশের রিপোর্ট লিখিয়েছিলেন তার বাবা শ্রী পাল।

আরও খোঁজ খবরের জন্য শ্রী পালের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তার লেখানো রিপোর্টের কথা তুলে অফিসার শ্রী পালকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখনও কি আপনি আপনার মেয়ের খোঁজ পাননি ?

—খবর পেলে এত কান্নাকাটির কোন কারণই ছিল না। এখন তো আমি একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছি। শ্রী পাল দুঃখ করে বললেন।

পুলিস অফিসার দু বছর আগে সিমলাগড়ের পুকুরে পাওয়া মহিলার লাশের ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি একে চেনেন ?

ফটো দেখে শ্রী পাল চমকে গেলেন, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললেন—এই তো আমার সেই মেয়ে পুষ্পর ফটো……সে কি সত্যিই আর নেই ?

—এত ভেঙে পড়বেন না……কি আর করবেন বলুন। ……বরং আমায় সব কথা খুঁটিয়ে বলুন……

—হায় হায় এতে আর আপনাকে বলবার কি আছে ? এ সবই খুনী পাঁচু আর তার নতুন বৌ মহামায়ার কারসাজি।

—পাঁচু কে ? পুলিস অফিসার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

কয়েক বছর হল তারই সঙ্গে আমার মেয়ে পুষ্পর বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু একটা দিনও সে সুখ পায়নি। পাঁচু এক এক করে তিনটে বিয়ে করেছে। তার অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পুষ্প আমার কাছে চলে এসেছিল। তারপর আমিই অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে তার স্বামীর ঘরে

পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সে আমায় বার বার বলেছিল যে নতুন বৌয়ের হাতের পুতুল পাঁচু তাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।

অফিসার উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলেন—তারপর কি হল।

—পুষ্পকে তাড়াবার জন্যে পাঁচু তার উপর অকথ্য অত্যাচার করতে লাগল। প্রায় দু বছর হল আমি একদিন মেয়ের খবর নিতে পাঁচুর ঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে যখন শুনলাম যে পুষ্প কিছু দিনের জন্যে এক আত্মীয়ের বাড়ী গেছে আমার খুবই ভয় ও সন্দেহ হল। সেই সময়ই আমি পুষ্পর নিরুদ্দেশ হওয়ার রিপোর্ট থানায় লিখিয়েছিলাম।

পাঁচুর প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস জানতে পারল যে বছর দুই আগে পাঁচু তার স্ত্রী পুষ্পকে নিয়ে কোথাও বাইরে গিয়েছিল এবং তারপর পুষ্প আর বাড়ী ফিরে আসেনি। পাণ্ডুয়ায় পাঁচুর এক আত্মীয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেও জানা গেল যে দু বছর আগে পাঁচু একবার তার স্ত্রীকে নিয়ে একদিন তার বাড়ীতে ছিল। সিমলাগড় স্টেশনের সেই দোকানদারও পাঁচুকে সনাক্ত করল দু বছর আগে এক ঝড়জলের রাতে ঐ যুবতীর সঙ্গে পাঁচুকে সে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছিল।

এইসব খবর সংগ্রহ করে পুলিস অফিসার পাঁচুকে জেরা করতে শুরু করলেন। পাঁচু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য পুষ্পর লেখা একখানা চিঠি অফিসারকে দেখাল। দু লাইনের এই চিঠিতে পুষ্প লিখেছে—আমি স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে যাচ্ছি, এর জন্য অন্য কেউ দোষী নয়।

চিঠির হস্তাক্ষর পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তা পুষ্পর হস্তাক্ষর নয়। পাঁচু একটা জাল চিঠি রেখেছিল নিজের অপরাধ গোপন করবার উদ্দেশ্যে।

পাঁচুকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হল। তার দোকান ও ঘর সার্চ করে পুলিস একটা ছেঁড়া সার্ট পেল তাতে ধোবার নম্বর ছিল এস, ৯৯২২।

পাঁচুকে দেখেই পাণ্ডুয়া থানার ইন্সপেক্টরের দু বছর আগেকার সেই রাত্রির কথা মনে পড়ল যখন খুব বৃষ্টিতে একটা ট্রাকে চড়ে থানায় ফিরছিলেন।

সিমলাগড়ে যাকে তিনি ট্রাকে লিফ্‌ট দিয়েছিলেন এবং রাস্তার মধ্যেই চলন্ত ট্রাক থেকে যে লোকটি সরে পড়েছিল সে পাঁচু ছাড়া আর কেউ নয়।

সমস্ত প্রমাণ জোগাড় করে পাঁচুর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের হল। পুলিসের কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধির জন্যই পাঁচুর ঐ জঘন্য অপরাধ ধরা পড়ল। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারে পাঁচুর আজীবন কারাদণ্ড হল।

কালো কোটধারী খুনী

সেদিন সন্ধ্যা ছটা বাজতে না বাজতেই বিড়ি ফার্মের ম্যানেজার বলদেব দাস নিজের কাজ বন্ধ করে দিলেন। তখনও মুন্সীকে হিসাব নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত দেখে বললেন—এখনও হিসেব মেলেনি নাকি ?

—না, হিসেব তো ঠিক হয়ে গেছে···মুন্সী কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলে—আজও অনেক টাকা।

—কত ?

—বারো হাজারের ওপর···মুন্সী চাপা গলায় বলল।

—তাহলে তো দোকান বন্ধ করে রওনা হওয়া উচিত। বেশী রাত করা ঠিক হবে না—বলদেব দাস ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল।

মুন্সী একটা থলিতে নোটের গোছাগুলো রাখল। তারপর আলমারীতে তালা বন্ধ করে যাবার জন্য তৈরী হল। দোকানে তালা লাগিয়ে বলদেব দাসও বাইরে এলেন তারপর তুজনে একসঙ্গে বাড়ীর পথ ধরলেন।

বলদেব দাসের বাড়ী একটা গলির মধ্যে ছিল। বাজার পার হয়ে তাঁরা যখন গলির মোড়ে ঢুকলেন সামনে কালো কোট পরা একটি লোককে এগিয়ে আসতে দেখলেন। কাছে এসে লোকটা বিত্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়ল। সে নিজের পকেট থেকে পিস্তল বার করে বিনা বাক্যব্যয়ে বলদেব দাসের ওপর গুলি চালিয়ে দিল। বুকে গুলি লাগতেই বলদেব দাস চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরক্ষণেই লোকটা মুন্সীর দিকে এগিয়ে এসে পরপর তুবার তাকে গুলি করল। মুন্সীও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে লোকটা নোটের থলিটা নিয়ে চম্পট দিল। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে কেউ কিছুই জানতেই পারল না। গুলির আওয়াজ শুনে পাশের বাড়ীগুলো থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে এল কিন্তু লোকটাকে ধরবার বা তার পিছু নেবার সাহস কারো

হলো না। কারণ পালাবার সময়েও সে পিস্তল থেকে গুলি বর্ষণ করছিল।

গোরখপুরের বাজারে সঙ্গে সঙ্গে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে হত্যা ও টাকা লুটের কথা শুনে লোক বিস্ময়ে আতঙ্কে হতবুদ্ধি। থানায় খবর পৌঁছানো মাত্র ইন্সপেক্টর কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

মুন্সী ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন। বলদেব দাসের বুকে গুলি লেগেছিল তাঁর অবস্থাও সঙ্কটজনক, তাঁকে তখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পুলিস অফিসার তাঁকে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে খুব কষ্টে তিনি কেবল কটি কথা বলতে পারলেন,

—কালো কোট···পরা একটা লোক···গুলি করে···থলি নিয়ে পালিয়ে গেল···।

কয়েক ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে হাসপাতালে বলদেব দাসেরও মৃত্যু হল।

ঘটনাস্থলে পুলিস একটা খালি কার্তুজ এবং একটা চটি পেল। চটি পেয়ে পুলিস অনুমান করল যে অপরাধে একাধিক ব্যক্তির হাত ছিল। কাছে পিঠে যারা অপরাধীকে দৌড়ে পালাতে দেখেছিল তারা শুধু এইটুকু বলতে পারল যে অপরাধী বেঁটে লোক, গায়ে কালো রঙএর কোট এবং তার গলার আওয়াজ খুব জোর। অবিলম্বে লোকটাকে খুঁজে বার করবার জন্য শহরের বড় বড় রাস্তা, রেলওয়ে ষ্টেশন ইত্যাদি প্রধান প্রধান জায়গায় পুলিস মোতায়েন হল।

ময়না তদন্ত করে বলদেব দাসের বুক থেকে পিস্তলের গুলি বার করা হল। বিশেষজ্ঞের মতে ৪৫৫ বোরের রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।

আর কোন সূত্র না পেয়ে পুলিস দাগী অপরাধীদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে লাগল। জানা গেল মহেন্দ্র সিং নামে একজনের কাছে সম্ভবত রিভলভার আছে। একথাও জানা গেল যে ঘটনার দিন মহেন্দ্র সিং নিজের এক

বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তারপর আর তার কোন খবর নেই। মহেন্দ্র সিংএর সম্বন্ধে অনেক লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিস জানতে পারে যে মহেন্দ্র সিং পাটনায় আছে।

খবরটা পাবামাত্র এক পুলিস অফিসারকে পাটনা পাঠান হল মহেন্দ্র সিংএর খোঁজ খবর নেবার উদ্দেশ্যে। গোরখপুর থেকে পাটনা অবধি দীর্ঘ ট্রেনের পথে অফিসার ভাবতে লাগলেন মহেন্দ্র সিংএর খবর কিভাবে ও কোথায় পাওয়া যাবে। ট্রেন যখন পাটনার আগে একটা বড় ষ্টেশনে থামল তখন তিনি ট্রেন থেকে নেবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করতে লাগলেন। হঠাৎ দেখেন কালো কোটপরা একটা বেঁটে লোক। খানিকক্ষণ প্ল্যাটফর্মের এক কোণে দাঁড়িয়ে অফিসার তার দিকে নজর রাখতে লাগলেন। একটু পরেই লোকটা একটা থার্ডক্লাস কামরায় উঠে পড়ল। তার চাল চলন দেখে অফিসারের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।

পুলিস অফিসার গার্ডকে বলে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং রেলওয়ে পুলিসের সাহায্যে ঐ সন্দেহজনক লোকটাকে থার্ড ক্লাস কামরার মধ্যেই ধরে ফেললেন। সার্চ করে তার কাছে ৪৫৫ বোরের রিভলভার পাওয়া গেল।

—তোমার নাম কি? অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

—রামসিং…

—তুমি কি গত মাসে গোরখপুরে ছিলে?

—না, আমি গোরখপুরে কখনও যাইনি।

—রিভলভারের লাইসেন্স কোথায়?

—এখন আমার সঙ্গে নেই।

মহেন্দ্র সিং না রাম সিং? এ সমস্যার এখনই সমাধান করতে হবে, কাজটা বেশ সহজ নয়। লোকটাকে সনাক্ত করতে না পারলে এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাবে না। বিনা লাইসেন্সে রিভলভার রাখার অপরাধে তাকে হাজতে পাঠান হল। তার কাছ থেকে পাওয়া রিভলভারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে বলদেব সিং এর বুকের মধ্যে থেকে যে গুলিটা ময়না

তদন্ত করে বার হয়েছিল সেটা এই রিভলভার থেকেই বার হয়েছিল। অনুসন্ধান করে আরও জানা গেল যে হাজতের লোকটা রাম সিং নয় তার নাম মহেন্দ্র সিং। জেলেই তাকে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা হল।

ধরা পড়ার পর পুলিসের জেরায় মহেন্দ্র সিং আব কোন উপায় না দেখে নিজের অপরাধ স্বীকার করল। স্বীকাবোক্তিতে সে বলল যে গোরখপুরের বলদেব দাস ও তাঁর মুন্সীকে সেই হত্যা করেছে। টাকা লুট করার উদ্দেশ্যেই সে তাদেব হত্যা করেছে। গোরখপুরেই আরও তিন জন লোকের নাম করল সে, এই তিনজন খুন ও লুটের ব্যাপারে তার সঙ্গী ছিল। ঐ তিনজনকেও অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হল।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে আদালতে হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে মামলা দায়ের হল। আদালতে মহেন্দ্র সিং নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে, কিন্তু পুলিসের কাছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় পাওয়া যেসব নির্ভুল প্রমাণ ছিল তার সাহায্যে মহেন্দ্র সিংএর ফাঁসির হুকুম হয়।

বিশ্বাসঘাতক ডাক্তার

প্রৌঢ়াবস্থায় স্বামীর মৃত্যুতে লক্ষ্মীবাঈ দুঃখ ও নিরাশায় ভেঙে পড়লেন। কোথাও আশার আলো দেখতে পেতেন না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একলা বসে অশ্রু বিসর্জন করতেন। নিজের বড় বড় দুটি ছেলে কিন্তু তাদের প্রতি কর্তব্যে লক্ষ্মীবাই-এর অবহেলা ছিল না। আত্মীয় স্বজন ছিলেন তাঁরাও তাঁর দুঃখ বুঝতে পারতেন। ছেলেদের প্রতি কর্তব্য বোধ ও আত্মীয় বন্ধুদের সমবেদনায় ধীরে ধীরে তিনি শোকের প্রথম আঘাত কিছুটা সামলে সংসারের কাজকর্মে সময় কাটাতে লাগলেন।

লক্ষ্মীবাঈ-এর স্বামী পুনার এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি প্রচুর বিষয় সম্পত্তি করেছিলেন—জমি জমা, বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার এবং ব্যাঙ্কে মোটা রকমের টাকা গচ্ছিত রেখে গেছেন। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মীবাঈ নিজের দুই ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর বড় ছেলে রামচন্দ্র সেনা বিভাগে কাজ পেয়েছে এবং ছোট ছেলে অরবিন্দ এক ফার্মে ভাল চাকরী করে।

দুই ছেলে দূরে যাবার পর লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। শূন্য বাড়ীখানা যেন তাঁকে গিলে খেতে থাকে, বিষণ্ণ জীবন একটা বোঝা বলে তাঁর মনে হত। সুখ সুবিধার কোন অভাবই তাঁর জীবনে ছিল না বটে কিন্তু আশা ও উৎসাহের অভাবে তাঁর মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হল, ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

লক্ষ্মীবাঈ পুনার এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার লাগুর শরণাপন্ন হলেন। পরীক্ষা করে ডাক্তার লাগু বেশ বুঝতে পারলেন যে লক্ষ্মীবাঈ-এর অসুখের কারণ তাঁর মানসিক অবস্থা। একদিকে লক্ষ্মীবাঈ-এর

ধন ঐশ্বর্য এবং অন্য দিকে তাঁর শোচনীয় মনের অবস্থা দুটোই বুঝতে ডাক্তারের দেরী হল না। এ অবস্থায় নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে ডাক্তার লক্ষ্মীবাঈ-এর ওপর নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সমবেদনাপূর্ণ ব্যবহার ও মিষ্ট কথাবার্তায় লক্ষ্মীবাঈ একেবারে গলে গেলেন আর ডাক্তারের কথায় উঠতে বসতে লাগলেন।

লক্ষ্মীবাঈ-এর কাছে ডাক্তার লাগুর আসা যাওয়া এত বেড়ে গেল যে পাড়া প্রতিবেশীরা তাই নিয়ে অনেক কথা বলাবলি করতে আরম্ভ করল। ধনী বিধবার ঘরে ডাক্তারের নিত্য যখন তখন আসাটা লোকে সন্দেহের নজরে দেখতে লাগল। ইতিমধ্যে তাঁর ছোট ছেলে অরবিন্দ ছুটিতে পুনায় এল। প্রতিবেশীদের কাছে অনেক কথা শুনে মায়ের প্রতি সে অত্যন্ত বিরক্ত হল এবং ডাক্তার লাগুর আসা যাওয়ার বিরুদ্ধে নিজের অভিমত স্পষ্ট করেই প্রকাশ করল।

পুনাতে এসে হঠাৎ অরবিন্দ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ল, চিকিৎসা দরকার। মা তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ডাক্তার লাগুকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। দু তিন দিন পর ডাক্তার লাগু অরবিন্দকে ইঞ্জেকশন দিতে আরম্ভ করলেন। একদিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ মারা গেল। তার অকালে এভাবে হঠাৎ মৃত্যুর সংবাদে সকলেই স্তম্ভিত হল, অনেকের মনে অনেক রকম সন্দেহও হল।

অরবিন্দের মৃত্যুর পর আর কোন বাধাই যেন রইল না, ডাক্তার লাগুর আসা যাওয়া আবার পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্মীবাঈ-এর ব্যাঙ্কের হিসাব পত্র, শেয়ার বেচা কেনা এসব প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ডাক্তার লাগু তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

নভেম্বর মাসে লক্ষ্মীবাঈ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার লাগু তাঁকে বোম্বাই-এর কোন হাসপাতালে ভাল করে দেখাবার জন্য

পরামর্শ দিলেন। তিনি রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন বাড়ীতে তালা দিয়ে লক্ষ্মীবাঈ ডাক্তার লাগুর সঙ্গে বোম্বাই রওনা হলেন। প্রায় এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার লাগু একা পুনায় ফিরে এলেন। লক্ষ্মীবাঈ-এর এক আত্মীয় তাঁকে লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তার লাগু জানালেন যে তিনি তীর্থযাত্রা করেছেন এবং তাঁর ঠিকানা ডাক্তারের জানা নাই।

বড় ছেলে রামচন্দ্র যখন শুনল যে তার মা তীর্থে গেছেন এবং বাড়ীর চাবি ডাক্তার লাগুর কাছে আছে তখন সে পুনায় এল। বাড়ীতে ঢুকে দেখে অনেক মূল্যবান ফার্নিচার রেডিও ইত্যাদি নেই। মায়ের সম্বন্ধে ডাক্তার লাগুর কাছ থেকে ঠিকমত কিছু জানতে না পেরে রামচন্দ্র পুলিসে খবর দিল।

এই সূত্রে অনুসন্ধানরত এক পুলিস অফিসার ডাক্তার লাগুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন······

—লক্ষ্মীবাই আপনার সঙ্গে বোম্বাই গিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, বোম্বাই-এর কোন হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবার জন্য লক্ষ্মীবাঈ আমার সঙ্গে বোম্বাই গিয়েছিলেন।

—ফিরলেন না কেন ?

—তীর্থযাত্রায় যাবেন ইচ্ছা ছিল তাই ফেরেন নি।

—বলতে পারবেন কি এখন তিনি কোথায় আছেন ?

—তাতো আমি জানিনা। তবে এ পর্যন্ত তাঁর দু খানা চিঠি আমি পেয়েছি, একখানা নাসিক থেকে এবং অন্য একখানা পুরী থেকে। উপস্থিত তিনি কোথায় আছেন তা আমি বলতে পারব না। ডাক্তার লাগু দুখানা চিঠিই অফিসারকে দিলেন।

এরপর পুনার পুলিসের কাছেও লক্ষ্মীবাঈ-এর এক চিঠি এল—

'ডাক্তার লাগুর সঙ্গে আমার অবৈধ সম্বন্ধের মিথ্যা অপবাদের দুঃখে

ও লজ্জায় আমি পুনা ত্যাগ করলাম। বাকী জীবন তীর্থে কাটাতে মনস্থ করেছি।'

এ চিঠি পাবার পর পুলিস লক্ষ্মীবাঈ-এর অনুসন্ধান বন্ধ করল।

এক বছরেরও বেশী কেটে গেল লক্ষ্মীবাঈ আর পুনায় ফিরলেন না। তাঁর আরও কয়েকটি চিঠি ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেল। শেষ চিঠিতে ছিল—

'আমি জয়পুরের কাছে রথৌড়ীতে এক বিপত্নীক ভদ্রলোককে বিবাহ করেছি। আমি আমার শেষ জীবনটা সুখে ও শান্তিতে কাটাতে চাই, সেইজন্য আর আমি পুনায় ফিরব না ঠিক করেছি।'

কিন্তু মায়ের এভাবে চলে যাওয়াটা রামচন্দ্রের ঠিক বিশ্বাস হলনা। হঠাৎ তীর্থযাত্রায় যাওয়া এবং তারপর রথৌড়ীর কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করা ইত্যাদি খবরে তার খুবই সন্দেহ হল। রথৌড়ী থেকে তার মায়ের এক চিঠি রামচন্দ্র পেল, তাতে দুটি শেয়ার সার্টিফিকেট ছিল এবং ব্যাঙ্ক থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রামচন্দ্রকে দেবার নির্দেশ ছিল। চিঠির খামে পুনার ডাকঘরের ছাপ দেখে রামচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে সমস্ত কাগজপত্র পুলিসকে দিয়ে, পুনরায় মায়ের অনুসন্ধানের জন্য থানায় খবর দিল।

সুতরাং পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ হল। লক্ষ্মীবাই-এর সমস্ত চিঠি ভাল করে পরীক্ষা করে জানা গেল যে সব চিঠির হস্তাক্ষর এক নয়। দ্বিতীয় ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেল যে জয়পুরের কাছে রথৌড়ী নামে কোন জায়গাই নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল যে লক্ষ্মীবাঈ-এর নিরুদ্দেশের মধ্যে এমন কোন রহস্য আছে যা ডাক্তার লাগুর কাছে অজ্ঞাত নয়।

এই সন্দেহ বশে ডাক্তার লাগুর বাড়ী খানাতল্লাস করা হল। লক্ষ্মীবাঈ-এর চিঠি ছাড়াও বহু শেয়ার পাওয়া গেল। শেয়ারগুলো ডাক্তার

লাগুর নামে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। হস্তান্তর করা কাগজপত্রে লক্ষ্মীবাঈ-এর হস্তাক্ষর পরীক্ষার ফলে জানা গেল সেগুলি জাল। ব্যাঙ্কের খাতায় লক্ষ্মীবাঈ-এর অ্যাকাউন্টে দেখা গেল অনেক টাকা চেকের সাহায্যে ডাক্তার লাগুর নামে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটা চেকেও লক্ষ্মীবাঈ-এর হস্তাক্ষর জাল করা হয়েছে।

ডাক্তার লাগুকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হল : পুলিস অফিসার তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন—এবার লক্ষ্মীবাঈ-এর সম্বন্ধে সত্য কথা বলে আপনার নাটক শেষ করবার সময় হয়েছে।

—আমি যা জানি তা সবই আপনাদের জানিয়েছি। উপস্থিত লক্ষ্মীবাঈ কোথায় আছেন তা জানিনা। ডাক্তার লাগুর কণ্ঠস্বর তখনও বেশ দৃঢ়।

—দেখুন, আর আপনি এভাবে আমাদের চোখে ধূলো দিতে পারবেন না। আমরা জানতে পেরেছি যে লক্ষ্মীবাঈ-এর যে চিঠিগুলো এসেছে সেগুলো তাঁর পাঠানো চিঠি নয়। এটাও পরীক্ষা করে জানা গেছে যে চেকে জাল স্বাক্ষর করে আপনি লক্ষ্মীবাঈ-এর অনেক টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন। আপনি পুনার একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। এই ব্যাপার যখন থেকে শুরু হয়েছে তার পর থেকে এইসব নিয়ে সংবাদপত্রে অনেক রকম খবর প্রকাশিত হয়েছে। আপনার স্বীকারোক্তি পেলেই এ সমস্ত শেষ হতে পারে।

অফিসারের কথা শুনে ডাক্তার লাগু অত্যন্ত ভয় পেলেন। সময় বুঝে অফিসার লাগুর স্ত্রীকেও ঘরে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সামনেই জেরা শুরু করলেন। স্ত্রীর সামনে ডাক্তার লাগু আর নিজেকে সংযত করতে পারলেন না, কম্পিত কণ্ঠে বললেন—লক্ষ্মীবাঈ মারা গেছেন।

—কেমন করে ? কবে মারা গেছেন ?

—এখান থেকে আমরা ট্রেনে বোম্বাই রওনা হয়েছিলাম। পথেই লক্ষ্মীবাঈ অজ্ঞান হয়ে যান। বোম্বাই পৌঁছে অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁকে এক হাসপাতালে

ভর্তি করে দিয়েছিলাম, সেই দিনই তিনি মারা যান—ডাক্তার লাগু সব রহস্য তুলে ধরলেন।

বোম্বাই-এর জিটি হাসপাতালে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে ইন্দুমতী বেনামে লক্ষ্মীবাঈকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেইদিনই তার মৃত্যু হয়। হাসপাতালে মৃত্যুর কারণ 'ডায়বিটিক কোমা' লেখা ছিল। মৃত্যুর পর মৃতদেহ বোম্বাই পুলিসকে দেওয়া হয়েছিল। লাশ বেওয়ারিশ বলে পুলিস ফটো নিয়ে লাশ ময়না তদন্ত করায়। মৃত্যুর দশদিন পরে ময়না তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় যে শরীরের ওপর কিছু ঘর্ষণের দাগ ছিল। এরপর বোম্বাই হিন্দু সমিতি মৃতদেহর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করে।

অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য পাওয়া গেল তাতে লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যুর কারণ জানা গেলনা। অবশেষে বোম্বাই-এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মেহতার কাছে পুলিস অভিমত প্রার্থনা করে। ডাক্তার মেহতার অভিমতে লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। অনেক যুক্তি দিয়ে ডাক্তার মেহতা একথা প্রমাণ করলেন যে বিষ প্রয়োগের ফলেই লক্ষ্মীবাঈ-এর মৃত্যু হয়েছিল।

পুলিসের তরফ থেকে ডাক্তার লাগুর বিরুদ্ধে হত্যা ও সম্পত্তি অপহরণের মামলা দায়ের করা হল। আদালতে ডাক্তার লাগুকে লক্ষ্মীবাঈ-এর হত্যাকারী বলে রায় দেওয়া হয় ও তার ফাঁসির সাজা হয়। রায়ের বিরুদ্ধে ডাক্তার লাগু আপিল করে কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট থেকে তার আপিল খারিজ হয়ে যায় ও ফাঁসির সাজা বহাল থাকে।

ফিয়েট গাড়ী ভেট রহস্য

পণ্ডিচেরীতে আমদানী রপ্তানী বিভাগের কন্ট্রোলার ভাস্করনের দিন খুব সুখেই কাটছিল। উচ্চ সরকারী পদ, মোটা মাইনে, থাকবার বাংলো এবং মোটর গাড়ী—এক কথায় জীবনের সব সুখ সুবিধাই তাঁর ছিল। ভাস্করনকে খুসী করবার জন্তে বড় বড় ব্যবসায়ীদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কারণ ব্যবসায়ীরা খুব ভালভাবেই জানত যে তাঁর কৃপাদৃষ্টি হলে লাখ লাখ টাকার কারবার তাদের মুঠোর মধ্যে।

পণ্ডিচেরীতে ভাস্করন একা থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও পরিবারবর্গ বেশীর ভাগ থাকতেন মাদ্রাজে। ভাস্করন সর্বদাই সেখানে যাওয়া আসা করতেন। ভাস্করন এবং তাঁর পরিবারের রাজসিক জীবনযাত্রা ইত্যাদি দেখে লোকে তাঁর সততা সম্বন্ধে অনেক রকম কথাই বলত, তবে নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় কেউই খোলাখুলি কিছু বলতে সাহস করত না। এই ভাবে দিন কাটছিল ভালই। কিন্তু একদিন পুলিসের কাছে খবর পৌঁছল যে ভাস্করন একটা নতুন ফিয়াট গাড়ী ঘুষ নিয়েছে।

সত্য কথাটা জানবার উদ্দেশ্যে পুলিসের জাল বিছাতে দেরী হল না। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল মাসকয়েক ধরে মাদ্রাজে ভাস্করনের স্ত্রীর কাছে একটা নতুন ফিয়েট গাড়ী দেখা যাচ্ছে। ভাস্করন মাদ্রাজে যখন যায় এই গাড়ীটাই ব্যবহার করে। গাড়ীর আসল মালিকের নাম জানবার উদ্দেশ্যে যাতায়াত বিভাগের কাগজপত্র দেখে পুলিস জানতে পারল যে এই গাড়ীখানা পদ্মনাভন্ বলে কোনো ব্যক্তির নামে রেজেষ্ট্রী হয়েছে, কিন্তু লিখিত ঠিকানায় খবর নিয়ে জানা গেল যে সে ঠিকানায় পদ্মনাভন্ বলে কেউ নেই।

তারপর পদ্মনাভনের সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে পুলিসের কাছে খবর পৌঁছাল যে সে শ্রীমতী ভাস্করনের খুড়োর ছেলে। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এখন

সে কেনৌর-এ থাকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য একজন পুলিস অফিসারকে কেনৌর পাঠান হল। এটা সেটা দুচার কথার পর অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি নতুন গাড়ী কিনেছেন নাকি?

—না তো, আমি নতুন গাড়ী কোত্থেকে কিনতে পারি বলুন? তাছাড়া রিটায়ার করার পর আমার গাড়ীর দরকারই বা কি?

—তা ঠিক, কিন্তু ত্রিচিনাপল্লীর মোটর কোম্পানীতে তো আপনার নামে একখানা নতুন ফিয়েট গাড়ী বিক্রী দেখান হয়েছে।

—আপনি কোন কারের কথা বলছেন—ও তো আমার নয়, পদ্মনাভন হেসে বললেন—আসলে আমার ভগ্নিপতি ভাস্করন পণ্ডিচেরীতে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কণ্ট্রোলার। মাস কতক আগে সে একটা নতুন গাড়ী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছিল। সেই আমায় বলেছিল যে বিশেষ কোনো কারণবশত ঐ গাড়ীখানা নিজের নামে না কিনে আমার নামে কিনতে চায়। তার এই প্রস্তাবে আমি রাজি হয়েছিলাম।

পদ্মনাভনের কথায় স্পষ্টই বোঝা গেল যে ও গাড়ীর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়…তাহলে গাড়ী কিনেছে কে? পুলিস অফিসার এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পদ্মনাভনের বিবৃতি দাখিল করে দিলেন।

ত্রিচিনাপল্লীর সেই মোটর কোম্পানীর রেকর্ড দেখা দরকার মনে করে পুলিস কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখলেন, সুনিশ্চিত খবর কিছুই পাওয়া গেলনা…গাড়ীর দাম কে দিয়েছে। অফিসার মোটর কোম্পানীর মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, কোম্পানী থেকে গাড়ীটা নিতে এসেছিল কে?

—পণ্ডিচেরীর ভাস্করনের ঠিকানা আমাদের দেওয়া হয়েছিল সেই মত আমাদের কোম্পানীর ড্রাইভার গ্যাড়ী পণ্ডিচেরীতে ভাস্করনের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছিল।

—আচ্ছা, বলতে পারেন গাড়ীর দাম কে দিয়েছিল?

—দাম নগদ টাকায় দেওয়া হয়েছিল, সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না কে টাকা দিয়েছে। কোম্পানীর মালিকের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে ঠিক কথা জানা গেলনা।

অবশেষে অফিসার মোটর বিক্রয় সংক্রান্ত পুরান কাগজপত্র থেকে বিল বুক পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল দুবারে ঐ গাড়ীখানার দাম দেওয়া হয়েছে। প্রথমবার পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে যেদিন গাড়ী কেনা হয়েছে। বিল বুকের বিল নম্বর ৩৩০৪-এতে দেখা গেল যে দ্বিতীয় বিল চার হাজার নয় শত তিপ্পান্ন টাকা তেরো আনার ছিল। তার পরের বিল নম্বর ৩৩০৫ এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রী আন্সারীর নামে এক চল্লিশ টাকা চার আনা ছ পাই-এর। বিলটার পেছনে পুলিস অফিসার দেখলেন যে দুটো বিলের টাকা পেন্সিল দিয়ে যোগ করে চার হাজার নয় শত পঁচানব্বই টাকা এক আনা ছ পাই লেখা হয়েছে। এতে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে শেষ দুটি বিলের টাকা একই ব্যক্তি একসঙ্গে দিয়েছে।

এই প্রয়োজনীয় সূত্রটি পাওয়ামাত্র পণ্ডিচেরীর এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট বিভাগের কণ্ট্রোলারের দপ্তর থেকে গত কয়েক মাসে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের নাম ধাম ইত্যাদির অনুসন্ধান শুরু হল। রেকর্ড দেখে জানা গেল যে কয়েক মাস পূর্বে ভাস্করন আন্সারীকে ৫,৬৯,৫২৪ টাকা মূল্যের কোটা সার্টিফিকেট দিয়েছে। আরও একটি বিষয় পুলিসের দৃষ্টি এড়াল না যে এর আগে আন্সারীকে মাত্র ১,৫০,৫০০ টাকা মূল্যের কোটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ আন্সারীকে আগের বারের চেয়ে বর্তমান বছরে বেশ কয়েক গুণ বেশী টাকার কোটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।

এ সম্বন্ধে শ্রী আন্সারীর কাছে পুলিস অফিসার জানতে পারলেন যে প্রথমে আন্সারীর প্রার্থনাপত্র ভাস্করন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আন্সারী মুখ্য কণ্ট্রোলারের দপ্তরে এর বিরুদ্ধে আপিল করে। আপিলে আন্সারীর প্রতি পূর্ব সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের সুপারিশ করবার আগে ভাস্করন আন্সারীর সঙ্গে নতুন

মোটরকারের চুক্তি করে নেয়। ভাস্করনের ইসারা পেয়ে আন্সারী সানন্দে গাড়ী উপহার দিতে রাজি হয় কারণ কোটা বৃদ্ধির ফলে তার অনেক গুণ লাভ হবার আশা ছিল। অপরাধ গোপন করবার জন্য গাড়ী কেনার টাকাটা দুবারে এবং নগদ টাকায় দেওয়া হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই গাড়ী পদ্মনাভনের নামে কেনা হয়।

ভাস্করনের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ পাবার পর মাদ্রাজের স্পেশাল জজের আদালতে তার বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। স্পেশাল জজ ভাস্করনকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও গাড়ী বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন। ভাস্করন মাদ্রাজ হাইকোর্টে সাজার বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করে। কিন্তু হাইকোর্ট থেকেও সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তার সাজা বহাল থাকে, কেবল হাইকোর্টে কারাদণ্ডের মেযাদ কমিয়ে দিয়ে বলা হয় যে এ পর্যন্ত যতদিন তার কারাবাস হয়েছে তাই যথেষ্ট।

ধনদেবীর বলি

অন্ধ্ররাজ্যের শ্রীকাকুলাম জেলার ধনসারা গ্রাম। চারদিকে নারকেল গাছের সারি, ঘাস খড়ের চালার কুটির আর পুকুর ঘাট। গ্রামের কাঁচা রাস্তায় ধূলো উড়িয়ে গাই বলদের দল রোজ সকাল সন্ধ্যায় মাঠে যায়। তাদের সঙ্গে গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও মাঠে ঘুরে বেড়ায়, সারা দিন বাইরেই খেলা করে। গ্রামের লোক সারাদিন ক্ষেত খামার আর ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে। গ্রামের অশিক্ষিত লোকের তুকতাক ঝাড়ফুঁকে অসীম বিশ্বাস। রোজই কেউ না কেউ মানত করে, সকাল সন্ধ্যা গ্রামের অনেক ঠাকুর দেবতার মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রোজকার মত মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি, মন্ত্রপাঠের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আজ ছেলের দলের সঙ্গে ন'বছরের দামোদর সাহেব বাড়ী ফিরলনা। তার মা ও পরিবারের আর সবাই ঘরে ঘরে গিয়ে তাকে খুঁজতে লাগল। দামোদর ভোর বেলাতেই খেলতে গিয়েছিল।

দুদিন ধরে খোঁজ হল কিন্তু ছেলেটির কোন খবরই পাওয়া গেলনা। তৃতীয় দিনে দামোদরের বাড়ীর লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে গ্রামের এক অনেক দিনের পুরোনো কুয়োর কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে পেল একটি ছেলের লাশ ভাসছে। টেনে তুলে দেখা গেল লাশটি দামোদরেরই

গ্রামের মুন্সেফকে খবর দেওয়া হল। মুন্সেফ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বললেন—হা ভগবান, কি অন্যায়···নিশ্চয় কোন বদমাইশের কাজ। তার সাজা পাওয়া চাই ই চাই।···তারপর একটু চিন্তা করে বললেন—তবে এও হতে পারে, দামোদর হয়ত কুয়োর ধারে খেলা করতে করতে ভিতরে পড়ে গেছে···তবু পুলিসে খবর দেওয়া উচিত।

মুন্সেফ কোথরু থানায় ডায়েরী করিয়ে দিলেন।

গ্রামে পুলিস এসে অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করল, ঘটনা স্থলে এই প্রথম অনুসন্ধানের কোন ফল হলনা। মুন্সেফ গ্রামের মোড়ল, তিনি পঞ্চায়েৎ এবং আরও কিছু লোককে ডেকে পাঠালেন। সকলেরই অনুমান দামোদর খেলা করতে করতে কুয়োয় পড়ে গেছে। দামোদরের মায়ের বা তার অন্য লোকের কারুর ওপর কোন সন্দেহ হলনা।

ছেলেটির মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠান হল। গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে হাসপাতাল, পায়ে হাঁটা পথে যেতে হয়। বেশ কদিন পরে যখন মৃতদেহ হাসপাতালে পৌছাল তখন তাতে পচন ধরেছে। সুতরাং ময়না তদন্তেও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা গেলনা।

এই ঘটনার এক মাস পরে আর এক মঙ্গলবার দুটি ছেলে দুপুরবেলা খেলা করতে বেরিয়েছে। একজনের নাম ভেঙ্কট রাও, বয়স পাঁচ বছর অপরের নাম মেঘনাথ, বয়স প্রায় বছর ছয়েক হবে। রাত্রি হল, কিন্তু ছেলে দুটি বাড়ী এলনা। ছেলে দুটির মা বাপ চিন্তাকুল হয়ে পাগলের মত সারা রাত ছেলেদের খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও তাদের পাওয়া গেলনা। পরদিন ভোর হতে না হতে আবার খোঁজা আরম্ভ হল। গ্রাম থেকে একশ গজ দূরে একটা কুয়োর মধ্যে দুটি বালকের শব ভাসতে দেখা গেল। বার করে দেখা গেল সে শব দুটি ঐ দুটি কচি বালকের···ভেঙ্কটরাও ও মেঘনাথের।

এ খবর ছড়িয়ে পড়াতে গ্রামে আতঙ্ক ছেয়ে গেল। মুন্সেফকে খবর দেওয়া হল, তিনি থানায় রিপোর্ট করলেন। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ঘটনা স্থলে উপস্থিত হল। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। একুশজন লোককে বিশেষ ভাবে জেরা করা হল কিন্তু ঐ নিরীহ বালক দুটির মৃত্যু রহস্যের কোন কিনারাই হলনা। লাশ দুটি হাসপাতালে পাঠান হল। এবারেও লাশদুটি হাসপাতালে পৌছতে

পৌঁছতে আগের বারের মতই এত পচে উঠল যে এবারও মৃত্যুর কারণ ময়না তদন্তে ধরা পড়ল না।

পুলিস চিন্তায় পড়ল। এক মাসের মধ্যে তিনটি নিরীহ শিশুর একই ভাবে মৃত্যু আশ্চর্যের কথাই তো। মৃত্যুর কারণ জানা গেল না, কিন্তু পুলিস অফিসারের মনে প্রবল সন্দেহ যে ছেলেদের কেউ হত্যা করেছে। তাদের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

এবার পুলিস এই মৃত্যুর রহস্য ভেদের জন্য উঠেপড়ে চেষ্টা শুরু করল। বিজয়নগরমের পুলিস সুপার স্বয়ং গ্রামে এলেন সরেজমিন তদন্তের জন্য। কিন্তু অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও অপরাধের কোন সূত্রই পাওয়া গেলনা। তিনটি নিরীহ বালকের মৃত্যু রহস্যের কোন কিনারাই করতে পারলেন না তিনি।

বিজয়নগরমে ফিরে পুলিস সুপার এই কাজের জন্য তাঁর এক সহকারীকে ডেকে বললেন—একটা খুব কঠিন কাজের ভার দিতে চাই। ধনসারা গ্রামের তিন তিনটি ছেলেকে খুনের কথা তো আপনি শুনেছেন। আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে একটা বড় রকম রহস্য রয়েছে। গ্রামের লোক ভয়ে চুপ করে আছে···আপনাকে গ্রামে যেতে হবে···গ্রামের লোকেদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের পেট থেকে কথা বার করতে হবে।

সুপারের আদেশ পেয়ে পুলিস অফিসার অবিলম্বে ধনসারা গ্রামে রওনা হলেন। গ্রামে গিয়ে সাধারণ পোশাকে বাস করতে লাগলেন, গ্রামের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের একজন হয়ে গেলেন। তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা, আড্ডা দেওয়া এই হল তাঁর কাজ। এইভাবে গোপন রহস্যের অনুসন্ধান চলল।

অফিসার দেখলেন গ্রামের লোক বড়ই গরীব, ঘোর কুসংস্কার তাদের মনে। রোজ ঝাড়ফুঁক, যাদুটোনা, আর দেব দেবীর কাছে

মানত লেগেই আছে। এও বুঝলেন যে গ্রামের মুন্সেফের প্রভাব লোকেদের ওপর খুব বেশী, মুন্সেফই গ্রামের মোড়ল। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও মুন্সেফের বিশেষ বন্ধু।

অফিসার বেশ বুঝলেন যে গ্রামবাসী সকলেই তাঁর ভয়ে একটি কথাও বলে না। তাদের মন থেকে ভয়টা দূর করা যায় কি করে? নিজেকে গ্রামবাসীদের কাছে বিশ্বাস ভাজন প্রতিপন্ন করবার জন্য বুদ্ধিমান অফিসার খুব চেষ্টা করতে লাগলেন।

লক্ষ্য করলেন গ্রামের দুজন লোক সদা সর্বদাই মুন্সেফের কাছে যাতায়াত করে। তাদের চোখ দেখলে মনে হয় তারা যেন একটা গূঢ় রহস্য গোপন করে রাখছে। তারা আসে যায় কিন্তু কোনো কথা বলে না। একজনের নাম ত্র্যম্বক এবং অপরের নাম শঙ্করন্। অফিসার এই দুজনের সঙ্গেই বিশেষ বন্ধুত্ব করে নিলেন, তারাও ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে অনেকটা খোলাখুলি কথাবার্তা বলতে লাগল।

তারপর একদিন রাত্রে পুলিস অফিসার কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে মুন্সেফ, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করলেন।

* * * * * *

আজ বিজয়নগরম আদালতে এই শিশুগুলির হত্যার মামলার রায় দেবার দিন। আদালত লোকে লোকারণ্য। জজ রায় দিয়ে বললেন— মামলায় সাক্ষী ও প্রমাণ দ্বারা একথা সিদ্ধ হয়েছে যে তিনটি বালকের মৃত্যুতে আসামীদের হাত ছিল। সেইজন্য তাদের প্রত্যেককে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হল।

রায় শুনেই মুন্সেফের স্ত্রী আর্তনাদ করে পড়ে গেল ও চিৎকার করে বলতে লাগল—ধনশক্তি, ধনশক্তি। দেবী, আমাদের বাঁচাও। সে রাত্রে তুমি আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে, আমার নিজের তিন ছেলে অথবা গ্রামের তিন ছেলেকে বলি না দিলে আমার

সর্বনাশ হবে। মঙ্গলবারে বলি দিতে হবে। আমি প্রতি মঙ্গলবারে তোমার পূজো করি। তোমার আদেশেই আমি গ্রামের ঐ তিনটি শিশুকে শ্বাসরুদ্ধ করে তোমার কাছে বলি দিয়েছি। ধনশক্তি, তোমার পূজোর কি এই ফল? বলতে বলতে স্ত্রীলোকটি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

মুন্সেফ ত্র্যম্বক ও শঙ্করন্‌কে গালাগালি দিচ্ছিল—তোরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস। বলিদানের পর তোরা হঠাৎ আমার ওখানে এসে পড়েছিলি। বস্তার মধ্যে থেকে ছেলেটার একটা পা বেরিয়েছিল, তোরা দেখতে পেয়েছিলি কিন্তু আমি কি তোদের মুখ বন্ধ করতে এতগুলো টাকা দিইনি? দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা গোপন রাখার প্রতিজ্ঞা করেছিলি তোরা। করিসনি? বিশ্বাসঘাতকের দল!

খিবিরহাটে খুন

কলকাতার কাছে খিবিরহাট বলে একটা ছোট গ্রাম আছে। সেদিন ভোরে গ্রামের বাইরে শ্মশানে এক যুবতীর লাশ পড়ে থাকার খবর পেয়ে সারা গ্রামে হুলুস্থুল পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্মশানে কৌতূহলী লোকেদের ভিড় জমে গেল। গ্রামের কেউই যুবতীর লাশ দেখে সনাক্ত করতে পারল না, ফলে সকলেই কিছু না কিছু অনুমান করতে লাগল। কোন ক্রমেই মৃতদেহের রহস্য কেউই ভেদ করতে পারল না। গ্রামের মোড়ল পুলিসকে খবর দিল।

খবর শুনেই ইন্সপেক্টর শ্রী রায অবিলম্বে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। গ্রামে এসে সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন মৃত যুবতীকে কেউ চেনে কি না। সবাই বলল, তারা কেউই চেনে না, এমনকি তাকে কেউ কোনদিন গ্রামেও দেখেনি। মৃতা যুবতীর মাথায় সিঁদুর দেখে অনুমান করা হল সে বিবাহিতা। শবের কাছে দুজোড়া চটি পড়েছিল—একজোড়া মেয়েদের ও অন্য-জোড়া পুরুষের চটি। মৃতদেহ ভাল করে পরীক্ষা করে শ্রী রায় দেখলেন যে মেয়েটির গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সনাক্ত হতে না পারায় পুলিস মৃতদেহের ফটো তুলে রাখল এবং মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হল। ঘটনাস্থলে পুলিস এমন কোন সূত্রই খুঁজে পেল না যাতে মেয়েটির নামধাম জানা যায় অথবা কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। শেষে পুলিস মৃতা যুবতীর ফটো কলকাতার একটি বাংলা দৈনিক পত্রে প্রকাশ করে তা সনাক্তের জন্য আবেদন জানালেন।

সংবাদপত্রে যেদিন ফটো প্রকাশিত হল সেই দিনই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক কাগজখানা নিয়ে দমদম থানায় উপস্থিত হলেন। পুলিস অফিসারকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবি দেখিয়ে বললেন—এ ফটো আমার মেয়ে সাধনার—আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোকে দুঃখে ভারাক্রান্ত।

—তাই নাকি······ইন্সপেক্টর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—আপনার কন্যার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত······কিন্তু······

—মৃত্যু নয়, এ নিশ্চিত খুন······সাধনাকে খুন করেছে······ভদ্রলোক ইন্সপেক্টরের কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন।

—হতে পারে······আপনার কথা হয়ত ঠিক, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আপনি দয়া করে শান্ত হয়ে বসুন আর আমাকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলুন যাতে এই ব্যাপারে আমরা তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান শুরু করতে পারি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক চোখের জল মুছে রুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন—আমি প্রথম থেকেই সাধনাকে বুঝিয়েছিলাম, অন্য জাতে বিয়ে করে সে সুখী হতে পারবে না। কিন্তু সে আমার কথা কিছুতেই শুনল না। তার এমন মতিভ্রম হল যে ভাল মন্দ জ্ঞান একেবারেই হারিয়ে ফেলল······তার অদৃষ্টে যা ঘটবার ছিল তাই হল······

—যাই হোক, এসব কথা থাক। বলুন সাধনার বিয়ে কার সঙ্গে হয়েছিল?

—সাধনা আমার মেজ মেয়ে। আমার বড় মেয়ে রহড়ায় থাকে। সাধনা প্রায়ই তার দিদির বাড়ী যেত। সেখানেই পাড়ার অরুণ নামে একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়। আমি যখন কথাটা জানতে পারি তখন সাধনাকে অনেক করে বুঝিয়েছিলাম অরুণের সঙ্গে বিয়ে হলে সে সুখী হতে পারবে না। ওদিকে অরুণের মা-বাবারও এ বিয়েতে একেবারেই মত ছিল না।

—তারপর কি হল? উৎসুক অফিসার জানতে চাইলেন।

—একদিন হঠাৎ সাধনা অরুণের সঙ্গে পালিয়ে গেল। কিছুদিন পরে জানা গেল যে তারা বিয়ে করেছে। অরুণ চিংড়িহাটার রবার ফ্যাক্ট্রিতে কাজ করে, আর ঐখানেই দুজনে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে।

—এরপর কি সাধনা আর আপনাদের সঙ্গে দেখা করেনি? ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন।

—না তা নয়। এর মধ্যে সাধনা আমার সঙ্গে দু চার বার দেখা করেছে। তার সঙ্গে কথা বলে এইটুকু জানতে পেরেছিলাম যে অরুণের মাইনে খুব কম, তাদের অর্থের খুবই অনটন। আমি তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজের দমদমের বাড়ীতে রেখেছিলাম।

—বিয়ের পর সাধনার প্রতি অরুণের ব্যবহারের কোন পরিবর্তন দেখেছিলেন ?—ইন্সপেক্টর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

—ওপর থেকে তো সম্বন্ধ ভালই দেখতাম। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা হল অরুণের সঙ্গে সাধনা সুখে নেই। এর আসল কারণ অরুণের বাবা ও তার পরিবারের সবাই সাধনাকে ছেড়ে দেবার জন্যে অরুণকে কেবলই চাপ দিচ্ছিল।

—হুঁ, ইন্সপেক্টর কিছু একটা ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু সাধনার লাস ধিবিরহাটে এল কি করে…… ?

—অরুণের এক মাসী ধিবিরহাটে থাকে। তার সঙ্গে দেখা করবার অছিলা করে সাত আটদিন আগে অরুণ জেদ করে সাধনাকে তার সঙ্গে নিয়ে গেল, তারপর থেকে অরুণের কোন খবর নেই……আর সাধনার……বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ আবার জলে ভরে গেল।

—দুঃখ করে আর কি করবেন বলুন……আমরা আপনার সহযোগিতায় কেসটার পুরো অনুসন্ধান করব……যদি সত্যই অরুণ সাধনাকে খুন করে থাকে তাহলে তাকে সাজা পেতেই হবে—শ্রী রায় ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন।

সাধনার লাশের ময়না তদন্তে সিদ্ধ হল যে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। অরুণের সমস্ত খবর পুলিসের ডিটেকটিভ বিভাগ বার করল—জানা গেল সাধনাকে বিয়ে করার পর একদিকে কম রোজগারের ফলে তার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল অন্যদিকে তার মা বাবা সমস্তক্ষণ সাধনাকে ত্যাগ করবার জন্য তার ওপর চাপ দিতে লাগল। এই সব কারণে মানসিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত অরুণ সাধনাকে নিজের জীবন থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত করল।

অরুণের পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে পুলিস জানতে পারল যে আটদিন আগে অরুণ সাধনাকে নিয়ে নিজের এক কাকার ছেলে নারায়ণের সঙ্গে ট্রেনে চিংড়িহাটা গিয়েছিল।

এ প্রমাণ ছাড়াও, অরুণের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াটাও তার অপরাধের প্রমাণরূপে দেখা দিল। দুদিন ধরে চেষ্টা করে তবে পুলিস দমদমের রেলওয়ে স্টেশনের কাছে অরুণকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হল।

গ্রামের কয়েকজন লোকও অরুণকে সাধনা ও নারায়ণের সঙ্গে বহাস স্টেশনে নেবে ধিবিরহাটের পথে যেতে দেখেছিল। ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত চটি দু জোড়াও অরুণ ও সাধনার বলে প্রমাণ পাওয়া গেল। এই সমস্ত প্রমাণের সাহায্যে পুলিস অরুণ ও নারায়ণের বিরুদ্ধে সাধনাকে খুন করার অভিযোগে মামলা দায়ের করে। তারাই যে সাধনার খুনের জন্য দায়ী তা প্রমাণিত হল কেবল পরিস্থিতির বিচার করে।

কলকাতা হাইকোর্টে দুই আসামীর আজীবন কারাদণ্ড হল। জজ নিজের রায়ে এই অভিমত দিলেন—যে সব তরুণ তরুণী পরস্পরের আকর্ষণ ও প্রেমকেই বিবাহের আদর্শ বলে মনে করে তাদের উচিৎ এই মামলাটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।